সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

1. ১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
2. ২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
3. ৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
4. ৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
5. ৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
6. ৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
7. ৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
8. ৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
9. ৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
10. ১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
11. ১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
12. ১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
13. ১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
14. ১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
15. ১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
16. ১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
17. ১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
18. ১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা
19. ১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
20. ২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
21. ২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
22. ২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
23. ২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
24. ২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
25. ২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
26. ২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
27. ২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
28. ২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
29. ২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
30. ৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
31. ৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
32. ৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
33. ৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
34. ৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
35. ৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বেতার

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

চৈত্র ১৩৫১

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

বেতার-বিজ্ঞানের বিষয় সহজ ভাবে লেখাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইংরেজি ভাষায় এ-ধরণের বই অনেক আছে—কিন্তু বাংলা ভাষায় বেতার-বিজ্ঞানের সুসংবদ্ধ কোনও পুস্তকই নাই।

এ পুস্তক-রচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তালিকা থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তার জন্য প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তালিকার কতকগুলি শব্দ কিছু পরিবর্তন করে ব্যবহার করেছি। অনেক নতুন শব্দেরও প্রয়োজন হয়েছে। এই নতুন শব্দগুলির প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

"বিজ্ঞান-পরিচয়"-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও স্থানীয় বেতার-কেন্দ্রে পঠিত লেখাগুলি কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে এ পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। "বিজ্ঞান-পরিচয়ের" সম্পাদক ও ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নিকট সেজন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী।

বিষয়ের জটিলতা সত্ত্বেও বেতারের মূল কথাগুলি মোটামুটিভাবেও যদি সাধারণ পাঠকের নিকট সহজবোধ্য হয়, তবেই এ লেখা সার্থক মনে করব।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রমনা, ঢাকা।

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

সূচী

কোনি.

আমব্রোজ ফ্লেমিং

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

হাইনরিক হাৎস

বেতারের আদি পর্ব

শহরে বাস ক'রে রেডিওতে গান বা খবর শোনেন নি এমন লোক হয়ত খুব কমই আছেন। আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানের কল্যাণে নেহাৎ আনাড়ি লোকও আজ রেডিও-সেট চালিয়ে দেশ-বিদেশের বেতার-কেন্দ্র থেকে গানবাজনা বা বক্তৃতা শুনে থাকেন। বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের আজ যে উন্নতি দেখা যায়, সেই তুলনায় বেতার প্রেরক-যন্ত্রের উন্নতিও কিছু কম নয়। পৃথিবীর সবত্রই আজ বড় বড় রেডিও স্টেশন গড়ে উঠেছে। প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র ছাড়াও বেতার সম্পর্কে নানা বিচিত্র ও আশ্চর্য কলাকৌশলের অনেক যন্ত্র আজ উদ্ভাবিত হয়েছে। জলে স্থলে শূন্যে সর্বত্রই আজ বেতার-বিজ্ঞানেরই প্রয়োগ দেখা যায়। এই সব আশ্চর্য প্রয়োগ ও উন্নতির পশ্চাতে অনেক বিজ্ঞানীরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা রয়েছে।

বেতারের ইতিহাসে প্রথমেই যাঁর কথা স্মরণীয় তাঁর নাম জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল (James Clerk Maxwell)। ইনি ইংলণ্ডের একজন নাম-করা গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ্‌ ছিলেন। যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের কথা আজ সকলেই জানেন সেই অতি সাধারণ বিষয়ের কথা তিনিই সর্বপ্রথম প্রচার করেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, বিদ্যুতের তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংক্রমিত হতে পারে। যা কেবল সম্ভাবনা মাত্র ছিল—এর তেইশ বছর পরে তা বাস্তবে পরিণত হয়! ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হাইন্‌রিক হার্ৎস্‌ (Heinrich Hertz) সত্যসত্যই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করতে সমর্থ হলেন। তাঁর প্রেরক-যন্ত্র থেকে বিদ্যুতের তরঙ্গ পাঠিয়ে অদূরে এক গ্রাহক-যন্ত্রে এই তরঙ্গের অস্তিত্ব অকাট্যভাবে তিনি প্রমাণ করেন। হার্ৎসের এই যুগান্তকারী গবেষণাগুলি থেকেই বেতারের সূচনা।

হার্ৎসের পর বেতারের ইতিহাসে মার্কোনির (Marconi) নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ইতালির একজন বিশিষ্ট রেডিও-এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই এঁর নাম আজ সুপরিচিত। নানাভাবে বেতার-বিজ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বেতার-তরঙ্গ-প্রেরণে নানা কার্যকরী নতুন নতুন ব্যবস্থার উদ্ভাবনা ক'রে বেতার-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি ক'রে গিয়েছেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মার্কোনি যখন Isle of Wight-এর নীড্‌ল্‌স হোটেল (Needles Hotel) থেকে সোয়ানেজ (Swanage) পর্যন্ত সাড়ে সতেরো মাইল বেতার-সংকেত প্রেরণ করতে পেরেছিলেন তখন তা এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার মনে হয়েছিল! এর দু-বছর আগে রুষ অধ্যাপক পোপফ (Popoff) তিন মাইল দূর পর্যন্ত বেতার-সংকেত পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের হিউজ (Hughes)-ও এ বিষয়ে কিছু সফলতা লাভ করেছিলেন। ১৮৯৩ সনে আমেরিকার নিকোলা টেস্‌লা (Nikola Tesla)-র বেতার-সংকেত প্রেরণের ব্যবস্থা ও এর কিছু পরে বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী অলিভার লজ (Oliver Lodge)-এর বেতার প্রেরক-যন্ত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও প্রায় একই সময়ে (১৮৯৫-৯৬) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বেতারে সংকেত প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এ সময় সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ জগদীশচন্দ্রই সর্বপ্রথম উৎপাদন করেন। তাঁর প্রেরক-যন্ত্র থেকে তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই ছয় মিলিমিটারের বিদ্যুতের ঢেউ উৎপাদন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইতালীয় বিজ্ঞানী রিঘির (Righi) কাজও উল্লেখযোগ্য। এর বহু বছর পরে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার নিকল্‌স (Nichols) ও টেয়ার (Tear) এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এর চেয়েও ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ঢেউ সৃষ্টি করেছিলেন।

বেতারের আদি পর্বে যে-সব বিদ্যুতের ঢেউয়ের সাহায্যে বেতার-সংকেত প্রেরণ করা হ'ত, সেই সব ঢেউ এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের বিশেষত্ব এই যে, এদের এক-একটি ঢেউ উঠেই ক্রমে কম জোর হতে হতে মুহূর্তের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়। এই শ্রেণীর ঢেউকে সেজন্য বিলীয়মান (damped) তরঙ্গ বলা হয়। হার্ৎস্ সর্বপ্রথম যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করেছিলেন তা এই ধরণেরই। প্রেরক-যন্ত্রে পর-পর কতকগুলি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ (spark) সৃষ্টি ক'রে এই ধরণের কতকগুলি ছাড়া-ছাড়া তরঙ্গের দল (group) খুব সহজেই উৎপাদন করা যায়।
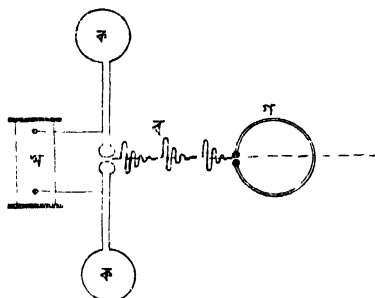
হার্ৎসের আবিষ্কার—ক ক—প্রেরক-যন্ত্র, খ—ইনডাক্শন (induction) কয়েল, গ—গ্রাহক-যন্ত্র, ব—বিলীয়মান তরঙ্গ-দল

বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিদ্যুতের ঢেউ তুলে বেতার-সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থারই নাম দেওয়া হয়েছে—স্পার্ক-টেলিগ্রাফি (spark telegraphy)। এই উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রেরক-যন্ত্রের নাম—স্পার্ক-ট্রান্স্মিটার (spark transmitter)। স্পার্ক-প্রেরক-যন্ত্র থেকে যে বিচ্ছিন্ন ও বিলীয়মান বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যায় তাতে কেবল সংকেত পাঠানোই সম্ভব—বেতারে কথাবার্তা এতে চলে না। বেতার-টেলিফোনির জন্য প্রয়োজন—অবিচ্ছিন্ন (continuous) ও সমান বিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। এই উদ্দেশ্যে মার্কোনি এক নতুন ব্যবস্থা করেছিলেন। এর নাম—

সময়ানুবর্তী স্পার্ক (timed spark)। এ ব্যবস্থায় বিলীয়মান তরঙ্গের বিস্তারকে মার্কোনি মোটামুটিভাবে সমান ক'রে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সময়ানুবর্তী স্পার্কের প্রেরক-যন্ত্র থেকে অনেকটা সমান বিস্তারের ঢেউ একটানাভাবে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী পউল্‌সেন (Poulsen) আর্ক (arc)-বাতি জ্বালিয়ে অবিচ্ছিন্ন ও সমবিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করার এক অভিনব ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে নির্মিত প্রেরক-যন্ত্রকেই আর্ক-ট্রান্‌স্মিটার বলে। এর দু-বছর আগে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী ডাডেল (Duddell) এই ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন। ডাইনামো (dynamo)-যন্ত্রের সাহায্যেও অবিচ্ছিন্ন ও সম-বিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আলেকজাণ্ডারসন (Alexanderson) ও গোল্‌ড্‌স্মিট (Goldschmidt) প্রভৃতি এঞ্জিনিয়ার-দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এর পর থার্মো-আয়নিক ভাল্‌ভ (thermo-ionic valve)-এর প্রবর্তন হয়। ভাল্‌ভের সাহায্যে বেতার-প্রেরক-যন্ত্রে যখন সম-বিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া সম্ভব হ'ল তখন থেকেই ভাল্‌ভ-ট্রান্‌স্মিটারের পর্ব। শুধু প্রেরক যন্ত্রে নয়, গ্রাহক-যন্ত্রে ও বেতারের অন্যান্য অনেক ব্যবস্থায় ভাল্‌ভের সাহায্যে নানারকম আশ্চর্য কাজ পাওয়া যায়। সেজন্য বেতার-জগতে একে "আলাদীনের প্রদীপ" বললেও অত্যুক্তি হয় না। বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের সম্পর্কেই বেতার-বিজ্ঞানে ভাল্‌ভের প্রথম প্রয়োগ। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞানী অ্যামব্রোজ ফ্লেমিং (Ambrose Fleming) সর্বপ্রথম এই ভাল্‌ভ নির্মাণ করেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-বিজ্ঞানী টমাস আল্‌ভা এডিসন (Thomas Elva Adision) বিজলি-বাতি নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার করেন—ফ্লেমিং-এর ভাল্‌ভ-নির্মাণ এই আবিষ্কারেরই ফল। মার্কোনি যখন আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক

প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বেতার-সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তখন ফ্লেমিং তাঁর সহকর্মী ছিলেন। বিদ্যুতের ঢেউ ধরবার জন্য এক যন্ত্রের পরিকল্পনা করতে গিয়ে ফ্লেমিং এডিসনের পরীক্ষালব্ধ তথ্যটিকে কাজে লাগালেন। ফলে গ্রাহক-যন্ত্রে দ্বিপদী (diode) ভাল্‌ভের প্রচলন হ'ল।

দ্বিপদী ভাল্‌ভের প্রথম পদটিকে ফিলামেণ্ট (filament) আর দ্বিতীয় পদটিকে প্লেট (plate) বা অ্যানোড (anode) বলে। ভাল্‌ভের ভিতর থেকে অনেকটা বাতাস বার করে নেওয়া হয়। সাধারণত বাতাসে এক সেণ্টিমিটার ঘনকে প্রায় ৩০০ কোটি বাতাসের অণু (molecule) থাকে। তা থেকে প্রায় ২৭০ কোটি অণু পাম্পের সাহায্যে বার ক'রে নিলে বাতাসের চাপ ৭৬০ মিলিমিটার থেকে ১ মিলিমিটারের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে পরিণত হয়। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে নির্মিত ভাল্‌ভে বায়ু-চাপের স্বল্পতা বিভিন্ন পরিমাণের হয়। উপযোগী কোনও ধাতুর সরু তার দিয়ে ফিলামেণ্টটি তৈরি হয়ে থাকে। ফিলামেণ্টকে মাঝখানে রেখে ধাতু-নির্মিত প্লেটটি চোঙের আকারে বসানো হয়। অন্যান্য ভাল্‌ভে প্লেটের আকার ও সংস্থান অন্যরকমও থাকে। ফিলামেণ্টের তারে বিদ্যুৎ চালনা করলে তা থেকে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-কণা নির্গত হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে উত্তপ্ত হয়ে কণাগুলি নির্গত হয় ব'লে এদের নাম থার্মো-আয়ন (thermo-ion)। এগুলি যে ঋণাত্মক বিদ্যুতের ক্ষুদ্রতম কণা তা অনেক দিন হ'ল প্রমাণিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্রতম ঋণ-বিদ্যুতের কণাকেই আমরা ইলেকট্রন (electron) বলি। কোনও কোনও ভাল্‌ভে ফিলামেণ্ট একটি ধাতুর সরু চোঙের ভিতর থাকে—চোঙের বাইরের দিকে বিশেষ বস্তুর প্রলেপ দেওয়া হয়, যাতে ফিলামেণ্টে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে চোঙটি যখন উত্তপ্ত হয় তখন তার বাইরে থেকে অসংখ্য ইলেকট্রন সহজেই বেরিয়ে আসে। ধাতুর এই চোঙটিকে ক্যাথোড (cathode) বলা হয়। কোনও বড় ব্যাটারির ধন-মেরু (positive pole) যদি ভাল্‌ভের প্লেটে ও তার

ঋণ-মেরু (negative pole) ফিলামেণ্ট কিংবা ক্যাথোডে যোগ করা হয়, তবে ফিলামেণ্ট বা ক্যাথোড থেকে ইলেক্‌ট্রনগুলি প্লেটের দিকে ছুটে যায়, কারণ ইলেক্‌ট্রনগুলি ঋণ-বিদ্যুতের কণা. আর ব্যাটারির সংযোগে ভাল্‌ভের প্লেটটি ধন-বিদ্যুতের গুণ পায়। এই ভাবেই প্লেট এবং ফিলামেণ্ট অথবা ক্যাথোডের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়।
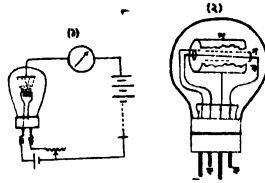
(১) দ্বিপদী ভাল্‌ভের সার্কিট (২) ত্রিপদী ভাল্‌ভের নক্‌সা
গ—গ্রিড, ফ—ফিলামেণ্ট, প—প্লেট

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এই দ্বিপদী ভাল্‌ভে আমেরিকার লী ডি ফরেস্ট (Lee de Forest) প্লেট ও ফিলামেণ্টের মাঝামাঝি জায়গায় একটি তৃতীয় পদ সন্নিবিষ্ট করেন। একেই গ্রিড (grid) বলে। সাধারণত একটি কুণ্ডলিত তার দিয়ে এটি তৈরি। এই গ্রিড-পদটি ভাল্‌ভকে অনেক বেশী কার্যকরা করেছে। ত্রিপদী (triode) ভাল্‌ভের সাহায্যে আজ বিদ্যুৎ স্পন্দনের উৎপাদন. বিদ্যুৎ-প্রবাহের বিবর্ধন ইত্যাদি নানা কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ত্রিপদী ভাল্‌ভ ছাড়াও চতুষ্পদী, পঞ্চপদী, ষট্‌পদী, সপ্তপদী, অষ্টপদী প্রভৃতি বহুপদবিশিষ্ট অনেক রকম ভাল্‌ভ আজকাল তৈরি হয়েছে। বেতার-বিজ্ঞানের নানা কাজে এদের ব্যবহার চল্‌ছে।

প্রথম যখন হার্ৎ‌স বিদ্যুতের ঢেউ সৃষ্টি করেছিলেন তখন তা ধরবার জন্য তাঁর গ্রাহক-যন্ত্র ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। চক্রের আকারে একটি তামার তারই ছিল এ যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। বিদ্যুতের ঢেউ এই

তারে এসে লাগলেই এতে ক্ষীণভাবে বিদ্যুৎ-চলাচল সুরু হয়—তড়িৎ-বিজ্ঞানের এ একটি মূল কথা। বিদ্যুতের ঢেউ যেমন ওঠে-নামে, তামার তারে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার হয় তাও তেমনি এদিক-ওদিক ক্রমান্বয়ে দিক পরিবর্তন করে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করে ব'লে একে বিদ্যুতের স্পন্দন বলা যেতে পারে। এই স্পন্দন খুব জোরালো করা সম্ভব, যদি চক্রাকার তামার তারটির গঠন, মাপ ও আকার উপযুক্ত হিসাবমত হয়। তারের বাদ্যযন্ত্রের দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি বোঝা হয়ত সহজ হবে। সেতার কিংবা এস্রাজের তার নেওয়া যাক্। কোনও একটি তারে টংকার দিলে তাতে কম্পন বা স্পন্দন হয় এবং এই স্পন্দন পাশের তারগুলিকেও অল্প-স্বল্প কাঁপিয়ে তোলে। যে তারে টংকার দেওয়া হয় সেই তারের সুরের সঙ্গে যদি পাশের কোনও তার একসুরে বাঁধা থাকে তবে টংকার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধা তারটিও দেখা যায় বেশ জোরে কেঁপে বেজে ওঠে। এই সুর-সঙ্গতির ফলেই হয় অনুনাদ (resonance)। হার্ৎসের তামার তারটিতে যে বিদ্যুতের স্পন্দন হয় তাতেও এরকম অনুনাদ সম্ভব, যদি প্রেরিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সহিত তামার তারটিকে সুর-সঙ্গত ক'রে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও আমরা সুর-বাঁধা বা tuning বলতে পারি। অনুনাদ-প্রসঙ্গে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ছোট ছেলে যখন দোলনায় দোলে, আর একজন তাকে দোল দেয়। দোলনা যখন ঠিক উপরের দিকে উঠতে থাকে, ঠিক সেই মুহূর্তে যদি প্রতিবার দোল দেওয়া যায় তবে একটু পরেই দেখা যায় দোলনের বিস্তার খুব বেড়ে গিয়েছে। যখন-তখন যে-সে ভাবে দোল দিলেই বিস্তার বাড়ে না, অনেক সময় বরং কমে যায়। দোলনার সঙ্গে দোল-দেওয়ার সঙ্গতি থাকা দরকার। দোলনার দোলন-কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি দোল দেওয়া যায় তা হলেই হয় অনুনাদ। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বেলায়ও এই কথা খাটে। তামার তারটিতে ঢেউ

লেগে যখন বিদ্যুতের স্পন্দন হয় তখন এই স্পন্দনের পর্যায়-কাল (period) তারের গঠন, মাপ, আকার ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। চক্রাকার তামার তারটি যদি এমন ভাবে তৈরি করা হয় যে এর ভিতর বিদ্যুতের স্পন্দন হলে তার স্পন্দন আগন্তুক বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ওঠা-নামা বা স্পন্দনের সঙ্গে তাল রেখে চলে, তবে ঐ তারে বিদ্যুৎ-স্পন্দন বেশ জোরালো ভাবেই প্রকাশ পাবে তাতে সন্দেহ নাই। চক্রাকার তারটিতে যদি অল্প একটু ফাঁক রাখা হয় তবে এই ফাঁকে জোরালো বিদ্যুতের স্পন্দন স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে। হার্ৎস্ তাঁর প্রেরক-যন্ত্র থেকে যে বিদ্যুতের ঢেউ সৃষ্টি করেছিলেন তার অস্তিত্ব তিনি এইভাবেই প্রমাণ করেন।

হার্ৎসের এই সহজ গ্রাহক-যন্ত্রটি প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেশী দূরে কাজ দেয় না। প্রেরক-যন্ত্র থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী দূরে বিদ্যুতের ঢেউ ধরবার জন্য এর পর এক অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। এর নাম সংসঞ্জক-

সংসঞ্জক-যন্ত্রিকার ব্যবস্থা
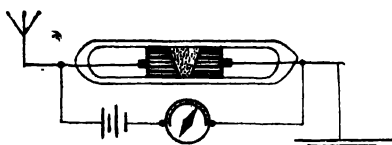
যন্ত্রিকা (coherer)। প্যারিসের অধ্যাপক ব্রান্‌লি (Branly) এই যন্ত্রিকা প্রথম প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী অলিভার লজ এবং আমাদের দেশে জগদীশচন্দ্র বসু সংসঞ্জক-যন্ত্রিকার অনেক উন্নতি করেছিলেন। দুটি ধাতু-দণ্ডের মাঝখানে একটি ফাঁকে রূপা নিকেল অথবা কোনও ধাতুর চূর্ণ কাচের আবরণের মধ্যে রাখা হয়। ধাতু-দণ্ড দুটি কোনও ব্যাটারির সঙ্গে যোগ করলে ধাতু-

চূর্ণের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ অতি অল্পই হয়, কারণ ধাতু-চূর্ণের মধ্যে অসংখ্য ফাঁক থাকায় এদের তড়িৎ-পরিবাহিতা (electrical conductivity) অত্যন্ত কম। কিন্তু বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন ধাতুচূর্ণে এসে পড়ে তখন দেখা যায় যে এর তড়িৎ-পরিবাহিতা অনেক বেড়ে গিয়েছে; মনে হয় ধাতুর চূর্ণ যেন গায়ে গায়ে জড় হয়ে বিদ্যুৎ-চলাচলের পথকে সুগম ক'রে দিয়েছে। কাজেই প্রেরক-যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সংসঞ্জক-যন্ত্রিকায় এসে পৌঁছলেই এর ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ আগের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ এভাবে বেড়ে গেলে তা যে-কোনও নির্দেশক যন্ত্রে ধরতে পারা কঠিন কাজ নয়। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের পৌঁছ-সংবাদ নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা ঘুরে যাওয়া দেখে যেমন জানা যায় তেমনি কোনও বৈদ্যুতিক ঘণ্টা নিয়ে এমন ব্যবস্থাও করা সম্ভব যাতে বিদ্যুতের ঢেউ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টাটি আপনা থেকেই বেজে ওঠে। অন্য প্রকার ব্যবস্থা করাও সম্ভব। মার্কোনির সংসঞ্জক-গ্রাহক-যন্ত্রে বেতার-বার্তার সংকেত কাগজের সরু ও লম্বা ফিতার উপর কালির আঁচড়ে আপনা থেকেই অঙ্কিত হয়ে যেত। গ্রাহক-যন্ত্রটিকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সঙ্গে সুর-সঙ্গত করে নেবার ব্যবস্থাও মার্কোনির যন্ত্রে ছিল।

মার্কোনির চুম্বক-গ্রাহক-যন্ত্র (magnetic detector) এখানে উল্লেখ-যোগ্য। এই যন্ত্রে ফিতার আকারে একটি লম্বা লোহার পাত চক্রাকারে
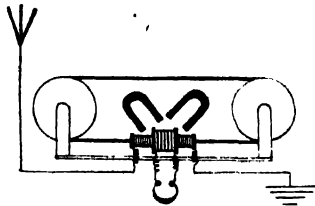
মার্কোনির চুম্বক-গ্রাহক-যন্ত্র (magnetic detector)

ঘোরাবার ব্যবস্থা থাকে। এরিয়েলের তারে একটি তারের কুণ্ডলী বা কয়েল (coil) যোগ করা হয় ও এই কয়েলের ভিতর দিয়ে লোহার ফিতাটি চালনা করা হয়। কয়েলের কাছেই চুম্বকের ব্যবস্থা থাকে। ফিতাটি চলতে চলতে যখন চুম্বকের কাছে আসে তখন লোহার ফিতাটি চুম্বকে পরিণত হয়। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এরিয়েলে লেগে যখন স্পন্দনের সঞ্চার হয়, লোহার ফিতার চুম্বকত্ব তখন স্পন্দনের জোর অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় কমে যায়। এরিয়েলের কয়েলের উপর আর একটি কয়েল জড়ানো থাকে—হেড-ফোন (head phone) এই কয়েলে যুক্ত থাকে। বেতার-সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে লোহার ফিতায় চুম্বকত্বের পরিবর্তন হওয়ায় হেড-ফোনে সংকেত অনুসারে শব্দ হয়।

১৯০১ সনে সর্বপ্রথম বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে ক্রিস্টাল (crystal)-এর ব্যবহার সুরু হয়। কার্বরাণ্ডাম (carborundum), গ্যালেনা (galena), বর্ণাইট (bornite), জিনকাইট (zincite), সিলিকন (silicon) প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ খনিজ ক্রিস্টালের টুক্‌রোর সঙ্গে ধাতুর পিন লাগিয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে
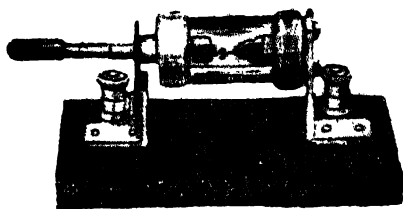
ক্রিস্টাল ও তৎসংলগ্ন পিন ('whisker')

ব্যবহার করলে খুব কাছের রেডিও স্টেশন থেকে বেতার-সংকেত, কথাবার্তা বা গান হেড-ফোনের সাহায্যে সহজেই শোনা যায়। গ্রাহক-যন্ত্রে যে এরিয়েল লাগানো হয়, মার্কোনিই সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এরিয়েলের তারকে দূরের স্টেশনের বিদ্যুৎ-

তরঙ্গের সঙ্গে সুর-সঙ্গত করার ব্যবস্থা অলিভার লজ সর্বপ্রথম প্রচলন করেছিলেন।

আজকাল বেতার-প্রেরক-যন্ত্র ও বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রে ভাল্‌ভই হ'ল প্রধান উপকরণ। ভাল্‌ভের প্রচলন ও এর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতার-বিজ্ঞানে এক নব যুগের সূচনা হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

বেতারের ক্রমবিকাশ

বেতার-টেলিগ্রাফির পর বেতার-টেলিফোনির প্রচলন হতে বেশী দেরি হয় নাই। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দেই বেতার-টেলিফোনির সূচনা হয় বলা যেতে পারে। এই বৎসরই আমেরিকার বিজ্ঞানী ফেসেণ্ডেন (Fessenden) এক মাইল দূর পর্যন্ত বিনা তারে কথাবার্তা চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯০৭ সনে তিনিই আবার ডাইনামো-যন্ত্রের সাহায্যে সম-বিস্তারের অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন ক'রে তার সাহায্যে কথা ও গান ১০০ মাইল দূর পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। প্রায় একই সময় জার্মানীর টেলিফুংকেন কোম্পানি (Telefunken Co.) নাউয়েন (Nauen) থেকে বার্লিন—এই ২০ মাইল পর্যন্ত আর্ক-ট্রান্‌স্মিটারের সাহায্যে বিনাতারে কথাবার্তা বলেছিলেন। ১৯১৩ সনে এই কোম্পানিই আবার ডাইনামো-যন্ত্র ব্যবহার ক'রে ৫৫০ মাইল পর্যন্ত বিনাতারে কথাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। ১৯১২ সনে ভান্নি (Vanni) নামে একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী এক নতুন ধরণের সময়ানুবর্তী স্পার্ক-ট্রান্‌স্মিটার ব্যবহার ক'রে রোম থেকে ত্রিপোলি —এই ৬২৫ মাইল দূর পর্যন্ত বেতারে কথাবার্তা চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ভাল্‌ভের পূর্ব-যুগে সম-বিস্তারের অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করা সহজ ছিল না। তা ছাড়া মাইক্রোফোনের সামনে কথা বল্‌লে বা গান গাইলে তাতে যে ধ্বনির জোর অনুযায়ী ক্ষীণ বিদ্যুতের প্রবাহ হয় তা বাড়িয়ে নেবারও কোন উপায় ছিল না। ভাল্‌ভের প্রবর্তনের সঙ্গে এই উভয় দিক দিয়েই খুব সুবিধা হ'ল। ভাল্‌ভের সাহায্যে সমবিস্তারের অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যেমন খুব সহজ হয়ে গেল, ভাল্‌ভের সাহায্যে কথা ও গানের ক্ষীণ বিদ্যুৎ-প্রবাহকেও তেমনি বহু সহস্র গুণ বিবর্ধিত করা সম্ভব হ'ল। এই ভাবে ভাল্‌ভের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতার-টেলিফোনির প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী মাইসনার (A. Meissner) ভাল্‌ভের সাহায্যে সর্বপ্রথম অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করেন। মাইস্‌নারের এই প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে এক বছরের মধ্যেই মার্কোনি কোম্পানী ৫০ মাইল দূর পর্যন্ত বিনাতারে কথাবার্তা প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯১৪ সনে যখন ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, যুদ্ধের প্রথম কয় বৎসর আমেরিকার বিজ্ঞানীরাই বেতার-টেলিফোনির উন্নতি সাধন করেন। দু-বছরের মধ্যেই ১৯১৬ সনে ভাল্‌ভের সাহায্যে প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র নির্মাণ ক'রে আমেরিকার আর্লিংটন (Arlington) থেকে হনলুলু (Honolulu) পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ মাইল দূরে বেতারে কথাবার্তা সম্ভব হয়েছিল। এই সময়ের প্রেরক-যন্ত্রে প্রায় ৫০০টি ভাল্‌ভ দরকার হয়। পরে ভাল্‌ভের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেশী শক্তির কাজ অল্পসংখ্যক ভাল্‌ভ দিয়ে ক্রমে সম্ভব হ'ল। ১৯২৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রের লং-আইল্যাণ্ডের রকি-পয়েণ্ট (Rocky Point) থেকে যখন উত্তর লণ্ডনের সাউথগেটে বেতারে কথা হয়েছিল তখনকার সেই প্রেরক-যন্ত্রে ২০টি শক্তি-সম্পন্ন ভাল্‌ভ ও গ্রাহক-যন্ত্রে মাত্র ৮টি ভাল্‌ভ ছিল;

অথচ লণ্ডনে বসে হেড-ফোন ও লাউড-স্পীকারে প্রায় ৬০ জন লোক আমেরিকা থেকে বক্তৃতা খুব স্পষ্টভাবে শুনেছিলেন।

১৯২৪ সনে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বেতার-টেলিফোনিতে সর্ব-প্রথম যোগাযোগ হয়। ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল (Cornwall)-এ পোল্‌ঢু (Poldhu)-তে মার্কোনি কোম্পানির প্রেরক-কেন্দ্র থেকে যে বেতারে কথা বলা হয়, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি (Sydney)-তে তা বেশ ভালই শোনা যায়। ১৯২৬ সনে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় দু-দিক থেকেই কথাবার্তা চালাবার ব্যবস্থা সুরু হয়। ইংলণ্ডে বেতার-টেলিফোনির প্রেরক-কেন্দ্র করা হয় রাগবি (Rugby)-তে। লণ্ডন থেকে কথাবার্তা প্রথমে তারযোগে রাগবিতে যায় আর রাগবি থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে আমেরিকার হোল্‌টন (Houlton) নামক স্থানে এক গ্রাহক-কেন্দ্রে সংক্রমিত হয়। হোল্‌টন থেকে এই কথাবার্তা আবার তারযোগে নিউ ইয়র্কে পাঠানো হয়। অন্য দিক থেকেও এই ধরনের ব্যবস্থা। নিউ ইয়র্ক থেকে কথাবার্তা প্রথমে তারযোগে রকি-পয়ণ্টে পাঠানো হয়; রকি-পয়েণ্টের প্রেরক-যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে এই কথাবার্তা আবার ইংলণ্ডের গ্রাহক-কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। সেখান থেকে এই কথাবার্তা আবার তারযোগে লণ্ডনে শোনা যায়। আজকাল ইংলণ্ডের ফাইফ্‌শায়ার (Fifeshire)-এর কিউপার (Cupar) নামক স্থানে নিউ ইয়র্ক থেকে কথাবার্তা শোনবার জন্য গ্রাহক-যন্ত্রের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানের লোকেরাও এই আটলাণ্টিক মহাসাগরের দু-মুখী বেতার-টেলিফোনির ব্যবস্থায় যোগ দিতে পারে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে কথাবার্তা তারযোগে রাগবিতে যায় আর আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে কথাবার্তা টেলিফোনের তারে রকি-পয়েণ্টে পাঠানো হয়। ১৯৩৩ সনে যখন লণ্ডন শহরে পোস্ট অফিস ইণ্টারন্যাশনাল টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জ (Post Office International Telephone

Exchange) প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই মিশর, ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, আরজেণ্টাইন, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ ও ইংলণ্ডের সহিত বেতার-টেলিফোনি নিয়মিতভাবে আরম্ভ হয়। এই গেল বেতার-টেলিফোনির ইতিহাস।

গান-বাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি প্রোগ্রাম—আজকাল যা পৃথিবীর বড় বড় বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে প্রেরিত হয় তাকে ইংরেজিতে ব্রড্‌কাস্‌টিং (broadcasting) বলে। বাংলায় একে 'ধ্বনি-বিস্তার' বলা যেতে পারে। মার্কোনি কোম্পানি ইংলণ্ডের এসেক্‌স্‌ (Essex)-এ চেম্‌স্‌ফোর্ড (Chelmsford) নামক স্থানে যে প্রেরক-কেন্দ্র স্থাপন করেন, ১৯২০ সনে সেই কেন্দ্র থেকেই ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম নিয়মিত ভাবে ধ্বনি-বিস্তার আরম্ভ হয়। এই বছরই ডেনমার্কের হেগ (Hague) স্টেশন থেকে নিয়মিত প্রোগ্রাম পাঠানো সুরু হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ওয়েষ্টিংহাউস ইলেকট্রিক কোম্পানিই (Westinghouse Electric Company) সর্বপ্রথম পিট্‌স্‌বার্গ (Pittsburg) থেকে ধ্বনি-বিস্তারের নিয়মিত ব্যবস্থা করেন ১৯২০ সনের নভেম্বর মাসে। এর পর থেকেই আমেরিকা, ইউরোপ ও ইংলণ্ডের অনেক স্থানে ধ্বনি-বিস্তার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯২৩ সন থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত বৃটিশ ব্রড্‌-কাস্‌টিং কোম্পানির পরিচালনায় ইংলণ্ডের বড় বড় স্থানে ধ্বনি-বিস্তার-কেন্দ্র[১] ও অন্যান্য কতকগুলি স্থানে ধ্বনি-সম্প্রসারণ-কেন্দ্র[১] (relay centre) স্থাপিত হয়। এর পূর্বে মার্কোনি কোম্পানির চালিত ধ্বনি-বিস্তার-কেন্দ্র মাত্র দুটি ছিল—চেম্‌স্‌ফোর্ড ও লণ্ডন। ১৯২৭ সনে বৃটিশ ব্রড্‌কাস্‌টিং কর্পোরেশন বা বি-বি-সি (B.B C.) নামে অন্য এক কোম্পানি রয়াল চার্টার (Royal Charter) নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়র্লণ্ডে

১ "ধ্বনি-বিস্তার" ও "ধ্বনি-সম্প্রসারণ" এ দুটি শব্দের জন্য ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট আমি ঋণী।

ধ্বনি-বিস্তারের ভার নেন। এই বি-বি-সি চালিত কেন্দ্রগুলির বিশেষত্ব এই যে একই কেন্দ্র থেকে অন্ততপক্ষে তুটি প্রেরক-যন্ত্র ধ্বনি-বিস্তারের কাজে একই সময় ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডে যেমন বি-বি-সি, আমেরিকায় তেমনি এন্-বি-সি (National Broadcasting Co.) ও কলম্বিয়া ধ্বনি-বিস্তার-প্রতিষ্ঠান (Columbia Broadcasting System)। ইউ-রোপের বড় বড় শহরেও এই সময় অনেক বেতার-কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য এক নতুন ধ্বনি-বিস্তার প্রচেষ্টা বি-বি-সি'র পরিচালনায় আরম্ভ হয়। তখন থেকেই ড্যাভেন্‌ট্রি (Daventry) স্টেশন থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য নিয়মিত ভাবে গান-বাজনা, বক্তৃতা, ঘোষণা ইত্যাদি চলে আসছে।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ধ্বনি-বিস্তার আরম্ভ হয় মাদ্রাজ শহরে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির রেডিও ক্লাব ১৯২৪ সনে নিয়মিত ভাবে মাদ্রাজ থেকে প্রোগ্রাম পাঠাতে সুরু করেন। এই সময় কয়েকজন বে-সরকারী বেতার-বিজ্ঞানীর চেষ্টায় কলিকাতা ও বোম্বাই থেকেও নিয়মিত ভাবে ধ্বনি-বিস্তার আরম্ভ হয়। ১৯২৭ সনে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্‌টিং কোম্পানি (Indian Broadcasting Co.) স্থাপিত হয়; ভারতবর্ষে সুনিয়ন্ত্রিত-ভাবে ব্রড্‌কাস্‌টিং এই বছর থেকেই সুরু হয় বলা চলে। বোম্বাই ও কলিকাতাই ছিল এই কোম্পানির প্রেরক-কেন্দ্র। ১৯৩০ সনে ব্রড্‌-কাস্‌টিং ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে আনা হয় এবং ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রড্‌-কাস্‌টিং সার্ভিস (Indian State Broadcasting Service) নামে কলিকাতা ও বোম্বাই থেকে বেতার-অনুষ্ঠান চল্‌তে থাকে। ১৯৩৬ সনে বি-বি-সি'র মিঃ কার্ক (H. L. Kirke) নামে একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে ভারতবর্ষে আসেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ব্রড্‌কাস্‌টিং-এর একটি পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বি-বি-সি'র সুদক্ষ রেডিও-এঞ্জিনিয়ার মিঃ গয়ডার (C. W.

Goyder)-এর তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের বড় বড় নয়টি স্থানে বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৩৬ সনে ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রড্‌কাস্‌টিং সার্ভিস্‌ নাম বদ্‌লিয়ে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও (All-India Radio) নাম দেওয়া হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত মাদ্রাজ কর্পোরেশন মাদ্রাজের বেতার-কেন্দ্রটি নিয়মিত ভাবে চালিয়ে এসেছিলেন। ১৯৩৮ সন থেকে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও মাদ্রাজ স্টেশনের ভার গ্রহণ করেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধান ছাড়াও বরোদা, মহীশূর, ত্রিবঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ ও গোয়ালিয়র এই কয়টি স্বাধীন রাজ্যেও বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃটিশ ভারতের অন্যান্য স্থানেও ছোট ছোট বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। তার কতকগুলি এখনও সম্ভবত বর্তমান আছে। এদের মধ্যে এলাহাবাদের এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন (Experimental Station), দেরাদুন ব্রড্‌কাস্‌টিং এসোসিয়েশন ও লাহোর ওয়াই-এম্‌-সি-এ ব্রড্‌কাস্‌টিং স্টেশন উল্লেখযোগ্য।

চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের বড় বড় শহরগুলিতেও কতকগুলি বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেতারের কল্যাণে পৃথিবীর সকল স্থানই যেন আজ অতি কাছাকাছি এসে পড়েছে!

হাজার হাজার মাইল দূরের গান বা কথাবার্তা যেমন মুহূর্তের মধ্যেই শোনা আজ সম্ভব হয়েছে, দূরের দৃশ্য বা ছবিও তেমনি বিনাতারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আজ প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে। আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম ক'রে ইতালি থেকে আমেরিকায় বিনাতারে ছবি পাঠানো সর্বপ্রথম সম্ভব হয়েছিল ১৯২২ সনে। জার্মান বিজ্ঞানী কর্ন (Korn) ইতালির সাঁপাওলো (Sanpaolo) থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মেইনের বার বন্দরে (Bar Harbour, Maine) বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে ছবি পাঠিয়েছিলেন। ১৯২৪ সনে আমেরিকার বিজ্ঞানী রেঞ্জার (R. H. Ranger) সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার ক'রে

বিনাতারে ছবি প্রেরণ করেছিলেন। এক সময় ইংলণ্ডের বেতার-কেন্দ্রগুলি থেকে নিয়মিত ভাবে ছবির আদান-প্রদান চলেছিল।

বেতারে ছবি পাঠানোর চেয়েও বিস্ময়কর কাজ—দূরের দৃশ্য বা ঘটনা যখন যেমন ঘটছে ঠিক তখনই তেমনিভাবে দেখতে পাওয়া। একে বলে দূরেক্ষণ বা টেলিভিশন (television)। বেতারে কথাবার্তা বা গান শোনবার সঙ্গে সঙ্গে বক্তা বা গায়ককে (অর্থাৎ ধ্বনির উৎসকে) চোখের সামনে দেখতে পাওয়া সত্যই এক অভিনব ব্যাপার! এই আশ্চর্য ব্যাপারও আজ বেতার-বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ১৯২৭ সনের ২৭শে জানুয়ারি জন লোগি বেয়ার্ড (John Logie Baird) নামে একজন স্কটলণ্ডবাসী বিজ্ঞানী লণ্ডনের একটি বাড়ির এক ঘর থেকে অন্য ঘরে জীবন্ত মানুষের চলন্ত ছবি বেতারে পাঠিয়েছিলেন—দূরেক্ষণের এই হ'ল প্রথম ফলপ্রদ চেষ্টা। এই সময় থেকেই বেয়ার্ড তাঁর প্রেরক ও গ্রাহক উভয় যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন। দূরেক্ষণ আজ ৫০।৬০ মাইল পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। বেয়ার্ডের পদ্ধতি ছাড়াও দূরেক্ষণের অন্য দুটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। একটির প্রবর্তক আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশনের (R.C.A) বিজ্ঞানী জোরিকিন (Zworykin) ও অন্যটি উদ্ভাবন করেন ফিলাডেলফিয়ার ফার্ন্স্‌ওয়ার্থ (Farnsworth)-ভ্রাতৃগণ। জোরিকিন ও ফার্ন্স্‌ওয়ার্থের ব্যবস্থা মূলত এক এবং বেয়ার্ডের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ইউরোপে দূরেক্ষণের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও বেতারের মূল কথা

আমাদের চারদিকে নানারকমের তরঙ্গ দেখা যায়। জলের ঢেউ তো চোখেই দেখ্‌তে পাই, বাতাসেও ঢেউ ওঠে। শব্দের তরঙ্গও আমাদের অতি পরিচিত। আবার ভূমিকম্পের ঢেউও আমাদের অপরিচিত নয়। সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো আসে, বিজ্ঞানীদের মতে সে একরকম তরঙ্গ—আবার বেতার-কেন্দ্র থেকে যে কথা ও গান ভেসে আসে, বিজ্ঞানীরা বলেন, তার মূলেও ঐ তরঙ্গ !

এই সব বিভিন্ন তরঙ্গকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) জড় পদার্থের তরঙ্গ, (২) শূন্যের ভিতর তরঙ্গ। জল, বাতাস প্রভৃতি জড় পদার্থে যে ঢেউ ওঠে তা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে জড় পদার্থই শক্তির বাহক। শব্দ-তরঙ্গও এই শ্রেণীর—কারণ শব্দের কম্পন বাতাস, জল, কাঠ, ধাতু প্রভৃতি জড় পদার্থের ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়। ভূমিকম্পের তরঙ্গও এই শ্রেণীর—কারণ এ ক্ষেত্রেও শক্তির বাহক পৃথিবীর মাটি। তাপ ও আলোর তরঙ্গ দ্বিতীয় শ্রেণীর। সূর্যের আলো বা তাপ শূন্যের ভিতর দিয়েও সংক্রমিত হতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বিকিরণ (radiation) বলে। সহজ ভাবে বোঝাবার জন্য বলা হয় যে আলো ও তাপের ঢেউ 'ইথর' (ether) নামে এক বস্তুর ঢেউ। কল্পনা করা হয় যে আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, ইট, কাঠ, মাটি, পাথর প্রভৃতি সব পদার্থেই এই বস্তুটি অনুপ্রবিষ্ট—আবার শূন্যেও এই 'ইথর' বর্তমান রয়েছে ! 'ইথর'-সমুদ্রে যে-সব তরঙ্গ ওঠে—আলো ও তাপকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত মনে করা হয়।

আলো ও তাপ যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় এই আশ্চর্য মতটি ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েলই সর্বপ্রথম প্রচার করেন। গণিতের

সাহায্যে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে যেখানেই বিদ্যুতের স্পন্দন হয় সেখান থেকেই বিদ্যুতের তরঙ্গ চারদিকে সঞ্চারিত হয় এবং এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতি-বেগ আলোর গতি-বেগের সমান। পরে হার্ৎস্ যখন সত্যসত্যই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন ক'রে ম্যাক্স্ওয়েলের সিদ্ধান্তটি সপ্রমাণ করেন, তখন থেকেই আলো, তাপ, বেতার-তরঙ্গ সবই যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ও এক পর্যায়ভুক্ত—এ কথা স্বীকৃত হয়েছে। তাপ, আলো ও বেতার-তরঙ্গ যেমন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ, বিজ্ঞানীদের মতে এক্স-রে (X-ray) বা রঞ্জন (Röntgen)-রশ্মিও তেমনি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। আবার তেজস্ক্রিয় (radio-active) বস্তু থেকে যে গামা-রশ্মি (γ-ray) বিকিরণ হয় তাও বিদ্যুৎ-তরঙ্গেরই অন্তর্গত। সব বিদ্যুৎ-তরঙ্গকেই 'ইথর'-তরঙ্গ বলে কল্পনা করা হয়।

তাপ, আলো, বেতার-তরঙ্গ, রঞ্জন-রশ্মি, গামা-রশ্মি প্রভৃতি সবই যদি বিদ্যুতের তরঙ্গ, তবে এদের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কাকে বলে জলের ঢেউয়ের দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা সহজ হবে। জলের ঢেউ লক্ষ্য করলেই দেখা যায়—এক জায়গায় একটু উঁচু, তারপরে একটু নীচু, আবার উঁচু, তারপরে আবার নীচু। ঢেউয়ের উৎসকে কেন্দ্র ক'রে পর পর এই ভাবে উঁচু ও নীচু চক্রাকারে দেখা যায়। উৎস থেকে যে-কোনও দিকে পর পর দুটি উঁচু বা চাপের (crest) কিংবা পর পর দুটি নীচু বা খোলের (trough) ব্যবধানকেই জলের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য বলে। যেখান দিয়েই ঢেউ বয়ে যায়, দেখা যায় সেখানকার জলের প্রত্যেকটি বিন্দু উপরে নীচে ওঠা-নামা করে। বড় বড় ঢেউয়ে ওঠা-নামার বিস্তার বেশী ও ছোট ঢেউয়ে কম; কাজেই বড়-ছোট ঢেউ আর দীর্ঘ-হ্রস্ব তরঙ্গ বলতে মোটেই এক জিনিষ বোঝায় না! ওঠা-নামা বা স্পন্দনের বিস্তারের উপর যেমন তরঙ্গের জোর নির্ভর করে, স্পন্দনের হার বা দ্রুতির উপর তেমনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। এক সেকেণ্ডে যত বার স্পন্দন

হয়, স্পন্দনের এই হার বা দ্রুতিকেই স্পন্দন-সংখ্যা (frequency) বলা হয়। জলের নীচে হাত রেখে হাতের পাতাটা উপরে নীচে বার বার নাড়িয়ে আমরা সহজেই জলে ঢেউ তুলতে পারি। খুব দ্রুত তালে যদি হাতের পাতাটি কাঁপানো যায় তবে দেখা যায় জলের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য ছোট হয়। তাল সমান রেখে জলের নীচে হাতের পাতার বিস্তার বাড়িয়ে-কমিয়ে একই দৈর্ঘ্যের বড়-ছোট ঢেউ তোলা সম্ভব। আবার খুব ধীরে ধীরে সময় নিয়ে যদি হাতের পাতা নাড়ানো যায় তবে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য বড় হতে দেখা যায়।

স্পন্দন-সংখ্যা ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে ঠিক কি সম্বন্ধ তা নির্ণয় করা কঠিন নয়। মনে করা যাক্, জলের কোথাও স্পন্দন সুরু হ'ল। ঐ স্থানের জল-বিন্দুটি সম্পূর্ণভাবে একবার স্পন্দিত হলে দেখা যায় যে বিক্ষেপের সাড়া উৎপত্তির স্থান থেকে ঠিক এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিমাণ এগিয়ে এসেছে। কাজেই এক সেকেণ্ডে যত বার স্পন্দন হয়, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সেকেণ্ডে তরঙ্গের বিক্ষেপ কত দূর এগিয়ে আসে তা জানা যায়। এ থেকে তরঙ্গ-তত্ত্বের এই নিয়মটি আমরা পাই—

তরঙ্গের গতি-বেগ = তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য × স্পন্দন-সংখ্যা

অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য = তরঙ্গের গতি-বেগ ÷ স্পন্দন-সংখ্যা

কিংবা স্পন্দন-সংখ্যা = তরঙ্গের গতি-বেগ ÷ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য

যে-কোনও তরঙ্গের পক্ষেই এই নিয়মটি খাটে। উদাহরণ-স্বরূপ, প্রথমে শব্দ-তরঙ্গের কথা ধরা যাক্। মধ্যম সপ্তকের সা-ধ্বনিতে বায়ু-কণার স্পন্দন সেকেণ্ডে ২৫৬ বার হয়। আমরা জানি এই ধ্বনির উৎস থেকে ধ্বনি এক সেকেণ্ডে ২৫৬ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এগিয়ে আসে ;—আবার এ কথাও জানি বাতাসে ধ্বনির গতি-বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১১০০ ফুট। সুতরাং

১১০০কে ২৫৬ দিয়ে ভাগ দিলেই সা-ধ্বনির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। এই ভাবে সা-ধ্বনির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৪$\frac{১}{৩}$ ফুট। তাপ, আলো, বেতার-তরঙ্গ, একস্-রে প্রভৃতি সব বিদ্যুৎ-তরঙ্গেরই গতি-বেগ এক। শূন্যের ভিতর দিয়ে গেলে এই গতি-বেগ সেকেণ্ডে ৩০ কোটি মিটার—অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬০০০ মাইল। বায়ু-মণ্ডলে এই গতি-বেগ প্রায় সমানই থাকে। কাজেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য জানতে হলে ৩০ কোটিকে স্পন্দন-সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলেই মিটারের হিসাবে তা পাওয়া যাবে।

জড় পদার্থে যে ঢেউ ওঠে তার স্পন্দন বেশ সহজেই বোঝা যায়—কিন্তু বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্পন্দন বলতে আমরা সত্যই কি বুঝি? এক কালে বলা হয়েছিল, এই স্পন্দন 'ইথরে'র স্পন্দন। কিন্তু বিজ্ঞানী আজ ইথরের বস্তুগত সত্তা স্বীকার করেন না। আধুনিক মতে এই স্পন্দন বিদ্যুতের স্পন্দন। বিদ্যুৎ-প্রবাহ যদি বার বার দিক্ পরিবর্তন করে, এই পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ (alternating current)-কেই বিদ্যুৎ-স্পন্দন বলা যেতে পারে। বড় বড় শহরে যে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহে বাতি জ্বলে বা পাখা চলে, সাধারণত তা সেকেণ্ডে ৫০।৬০ বার দিক্ পরিবর্তন করে; একেই ৫০।৬০, সাইকল (cycle)এর এ-সি (A C.) বলা হয়। এ অতি নিম্নহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন। বেতার-প্রেরক-যন্ত্রে এর চেয়ে অনেক বেশী দ্রুত বিদ্যুতের স্পন্দন সৃষ্টি করা হয়। দিক্-পরিবর্তন বা স্পন্দনের হার এ ক্ষেত্রে সেকেণ্ডে এক লক্ষ বার অথবা তারও বেশী। জলে স্পন্দন হলে জলে যেমন ঢেউ ওঠে, বেতার-প্রেরক-যন্ত্রের উঁচু এরিয়েলে বিদ্যুতের দ্রুত স্পন্দন হলেও তেমনি বিদ্যুতের ঢেউ ওঠে। বেতারের ঢেউ তুলতে হলে সেজন্য বিদ্যুৎ-স্পন্দন-উৎপাদক যন্ত্রের সহিত উপযুক্ত এরিয়েলের সংযোগ দরকার। তাপ, আলো প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গেও বিভিন্ন হারে বিদ্যুতের স্পন্দন হয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের একটি

তালিকা দেওয়া গেল। বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও স্পন্দন-সংখ্যা তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ	তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য	স্পন্দন-সংখ্যা	মন্তব্য
বেতার-তরঙ্গ	৫০,০০০ মিটার থেকে	৬০০০ থেকে	
	প্রায় ¼ মিলিমিটার	১২ হাজার কোটি	
তাপ-তরঙ্গ			
	" $\frac{১}{১২৫০}$ মি. মি.	৩⅛ কোটি কোটি	
আলোক-তরঙ্গ			হল্‌দে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $\frac{১}{১৭০০}$ মি.মি.
	" $\frac{১}{২৫০০}$ মি.মি.	৭½ কোটি কোটি	
অতি-বেগুনি আলোক-তরঙ্গ			
	" $\frac{১}{১০,০০০}$ মি.মি.	৩০ কোটি কোটি	
অজ্ঞাত			
	" $\frac{১}{১ লক্ষ}$ মি মি.	৩০০ কোটি কোটি	
এক্‌স্-রে			
	" $\frac{১}{১ কোটি}$ মি.মি.	৩০ হাজার কোটি কোটি	
গামা-রশ্মি			
	" $\frac{১}{১০ কোটি}$ মি.মি.	৩ লক্ষ কোটি কোটি	

এই তালিকায় দেখা যায় যে বেতার-তরঙ্গই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। হ্রস্বতম বেতার-তরঙ্গ ও দীর্ঘতম তাপ-তরঙ্গের মধ্যে আজ আর কোনও ব্যবধান নাই। তালিকায় তাপ-তরঙ্গের পরই দৃশ্য আলোর তরঙ্গ—লাল, নারেঙি, হল্‌দে, সবুজ, নীল, ঘন-নীল ও বেগুনি। এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পর পর ক্রমশ কমে আসে। এর পর অতি-বেগুনি (ultra-violet) আলোর তরঙ্গ। অতি-বেগুনি আলোর পর রঞ্জন-রশ্মি বা এক্‌স্-রে। দীর্ঘতম রঞ্জন-রশ্মি ও হ্রস্বতম অতি-বেগুনি আলোর মাঝখানে খানিকটা ব্যবধান এখনও অনাবিষ্কৃত আছে। গামা-রশ্মি বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মধ্যে হ্রস্বতম।

বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে আমরা দীর্ঘ, মধ্যম, হ্রস্বতর মধ্যম, হ্রস্ব ও অতি-হ্রস্ব (ultra-short) তরঙ্গ বলে থাকি। অতি-হ্রস্ব তরঙ্গের চেয়েও যার দৈর্ঘ্য ছোট তার নাম দেওয়া হয় মাইক্রো-তরঙ্গ (micro-wave)। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারে এরকম শ্রেণীভাগ করা হয়েছে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণত মিটারে রাখা হয়—এক মিটার এক গজের কিছু বেশী। অনেক সময় আবার বেতার-তরঙ্গ স্পন্দন-সংখ্যা দিয়ে সূচিত করা হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অথবা স্পন্দন-সংখ্যা অনুযায়ী বেতার-তরঙ্গগুলি নিম্নলিখিত ভাবে* ভাগ করা যায়ঃ—

বেতার তরঙ্গ	তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (মিটার)	স্পন্দন সংখ্যা (কিলো-সাইকল) প্রতি সেকেণ্ডে	মন্তব্য
	৫০,০০০	৬	ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত
দীর্ঘ তরঙ্গ	২১,৮২০ ১৮,৭৫০	১৩.৭৫ ১৬	ব্রেজিল-এর সেপ্টিবা (Septiba) স্টেশন রাগবি দীর্ঘ তরঙ্গের স্টেশন
	৩,০০০	১০০	
মধ্যম তরঙ্গ	৬০০ থেকে ২০০	৫০০ থেকে ১,৫০০	মধ্যম তরঙ্গের ধ্বনি-বিস্তার
হ্রস্বতর মধ্যম			জাহাজ ও যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত তরঙ্গ
	৫০	৬,০০০	
হ্রস্ব তরঙ্গ			হ্রস্বতরঙ্গের ধ্বনি-বিস্তার
	১০	৩০,০০০	
অতি-হ্রস্ব তরঙ্গ			কাছাকাছি স্থানে বেতার বার্তা ও দূরেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত তরঙ্গ
	১	৩০০,০০০	
মাইক্রো তরঙ্গ	একের নীচে	৩ লক্ষের অধিক	হ্রস্বতম মাইক্রো-তরঙ্গ ১৭ সেন্টিমিটার

* E. H. Chapman-এর পুস্তক হতে তালিকা দুটি সংকলিত।

এক কিলো-সাইক্‌ল (kilo-cycle)-এর অর্থ এক হাজার বার। মধ্যম বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা সাধারণত কিলো-সাইক্‌ল-এ রাখা হয়। হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা মেগা-সাইক্‌ল (mega-cycle)-এ ধরা হয়। এক মেগা-সাইক্‌ল-এর অর্থ দশ লক্ষ বার। হ্রস্ব-তরঙ্গে ধ্বনি-বিস্তারের জন্য আজকাল সর্বত্রই ১৩ মিটার থেকে ৯০ মিটারের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যাণ্ড (band) বেছে নেওয়া হয়েছে। এদের স্পন্দন-সংখ্যা সেকেণ্ডে প্রায় ৩ থেকে ২৩ মেগা-সাইক্‌ল। মধ্যম তরঙ্গে ধ্বনি-বিস্তার সাধারণত ২০০ থেকে ৬০০ মিটারে করা হয়—এদের স্পন্দন-সংখ্যা সেকেণ্ডে ৫০০ থেকে ১৫০০ কিলো-সাইক্‌ল। এখানে বলা দরকার দূর-দূরান্তের সংকেত কথা বা গান শুন্‌তে হলে হ্রস্ব-তরঙ্গগুলিই খুব কার্যকরী। মধ্যম তরঙ্গগুলি খুব বেশী দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে না। দূরেক্ষণ এবং কাছাকাছি স্থানে বেতার-বার্তা প্রেরণের জন্য অতি-হ্রস্ব তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

এইবার বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে সংকেত কথা বা গান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কি ক'রে প্রেরণ করা হয়—এই মূল বিষয়টির প্রধান কথাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব। বেতারে সংকেত পাঠানো খুব কঠিন কাজ নয়। টেলিগ্রাফ অফিসে 'টারে-টারে-টক্‌কা-টারে' শব্দের সঙ্গে কে না পরিচিত? ইংরেজিতে একে 'dot' ও 'dash' বলে। 'টারে' ও 'টক্‌কা'র বিভিন্ন সমাবেশেই মোর্শ (Morse)-এর সাংকেতিক বর্ণমালা। সাধারণ টেলিগ্রাফিতে এই বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়। বেতার-টেলিগ্রাফিতেও মোর্শের সংকেত অনুসারে বার্তা পাঠানো হয়। 'টারে' শব্দ 'টক্‌কা'র চেয়ে বিলম্বিত। 'টক্‌কা'র ক্ষণিক সময়ের জন্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে এক বিশেষ বর্ণ সূচিত করা হয়, আবার 'টারে'র অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ের জন্য বিদ্যুতের ঢেউ পাঠালে আর এক বর্ণ বোঝায়। এই ভাবেই 'টারে' ও 'টক্‌কা' অনুযায়ী বেশী ও কম

সময়ের জন্য বেতারের ঢেউ পাঠিয়ে বেতারে সাংকেতিক বার্তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বেতার-টেলিফোনি বা ব্রড্‌কাস্‌টিং-এর ব্যবস্থা এত সহজ নয়।

বেতার-টেলিফোনি বা ব্রড্‌কাস্‌টিং-এর জন্য মাইক্রোফোন দরকার। মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে বা গান গাইলে শব্দের জোর অনুসারে মাইক্রোফোনে বিদ্যুতের স্পন্দন সুরু হয়। এই বিদ্যুৎ-স্পন্দনের হার শব্দের স্পন্দন-সংখ্যার মতই খুব কম—সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ থেকে ১০ হাজার সাইক্‌ল বলা যেতে পারে। এ রকম নীচু হারকে শ্রাব্য স্পন্দন-সংখ্যা (audio-frequency) বলে। মাইক্রোফোনের নিম্নহার স্পন্দন ভাল্‌ভের সাহায্যে অনেকগুণ বাড়িয়ে টেলিগ্রাফের তার দিয়ে ট্রান্‌স্মিটিং স্টেশনের প্রেরক-যন্ত্রে প্রেরিত হয়। প্রেরক-যন্ত্রে যে বিদ্যুতের স্পন্দন সৃষ্টি করা হয় তা শব্দের স্পন্দনের তুলনায় খুবই উঁচু হারের। এই উচ্চ হারকে বেতার-স্পন্দন সংখ্যা (radio frequency) বলা হয়। স্টুডিয়ো থেকে আনীত নীচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন অনেকগুণ বিবর্ধিত করার পর প্রেরক-যন্ত্রের উচ্চহার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়েলে এক মিশ্র ধরনের বিদ্যুৎ-স্পন্দন দেখা যায়। এরিয়েলের তারে এই মিশ্র ধরনের বিদ্যুৎ স্পন্দনের জন্য এরিয়েল থেকে
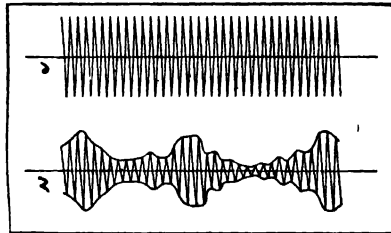
(১) বাহক-তরঙ্গ (Carrier wave) (২) মিশ্র বা বিকৃত তরঙ্গ (Modulated wave)

যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হয় তাও মিশ্র ধরনের হয়। একে তরঙ্গের বিকৃতিও বলা যেতে পারে। এই মিশ্র বা বিকৃত তরঙ্গকেই ইংরেজিতে modulated wave বলে; আমরা একে মিশ্র বা বিকৃত তরঙ্গ বলব। কথা বা গানের ঢেউ যেন প্রেরক-কেন্দ্রের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপর বসে দেশ-দেশান্তরে চলতে থাকে! এইজন্যই বেতার-প্রেরক-কেন্দ্রের অবিমিশ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে বাহক-তরঙ্গ (carrier wave) বলা হয়।

প্রতিদিনই প্রোগ্রাম অনুযায়ী পৃথিবীর প্রত্যেক বেতার-প্রতিষ্ঠানে স্টুডিয়োর গান বা কথার নীচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দনের সঙ্গে প্রেরক-যন্ত্রের উঁচু হারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন মিশিয়ে এরিয়েল থেকে মিশ্র বা বিকৃত তরঙ্গ পাঠানো হয়ে থাকে। এই মিশ্র বা বিকৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেতে যেতে পথে যখন কোনও এরিয়েলের তারে এসে পড়ে তখন এই তারেও মিশ্র বিদ্যুৎ-স্পন্দন সুরু হয়। এই স্পন্দন মূলত উঁচু হারের—শুধু এর উপর চাপানো থাকে কথা ও গানের নীচু হারের স্পন্দন। এরিয়েলের তারটি এখন যদি কোনও বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রে লাগানো হয় তবে গ্রাহক-যন্ত্রটি চালিয়ে এবং আগন্তুক তরঙ্গের উচ্চহার স্পন্দনের সঙ্গে একে সুর-সঙ্গত করলেই কথা ও গান শোনা যায়। বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রের কাজ—এই মিশ্র বিদ্যুৎ-স্পন্দন থেকে কথা ও গানের বিদ্যুৎ-স্পন্দনকে মুক্ত ক'রে দেওয়া। কথা ও গানের বিদ্যুৎ-স্পন্দন এইভাবে মুক্তি পেলেই তা হেড-ফোন বা লাউড-স্পীকারের পর্দায় তাদের নিজস্ব রূপে প্রকাশ পায়। এ কাজ কি ক'রে হয় তা জানতে হলে বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি ভাল করে বোঝা দরকার।

বেতার-তরঙ্গের উৎপাদন ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নিয়ন্ত্রণ

বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন করা হয় কি ক'রে ? এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে বেতার-যন্ত্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই উপকরণ বা যন্ত্রটিকে কন্‌ডেন্সার (condenser) বলে—আমরা একে বিদ্যুৎ-ধারক বলতে পারি। সমান্তরাল দুটি ধাতুর পাত দিয়ে সহজেই এই কন্‌ডেন্সার তৈরী করা সম্ভব। পাত দুটির একটির সহিত যদি কোনও ব্যাটারির ধন-মেরু এবং অন্যটির সহিত যদি ঋণ-মেরু যোগ করা যায় তবে এই দুটি ধাতুর পাতে বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়। যে পাতটি ধন মেরুর সহিত যোগ করা হয় সেটি ধন-বিদ্যুতের গুণ পায় ও যেটি ঋণ-মেরুতে লাগানো হয় সেটি ঋণ-বিদ্যুতের গুণ পায়। ব্যাটারি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলেও দেখা যায় ধাতুর পাত দুটিতে বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে। প্রত্যেক কন্‌ডেন্সারই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ ধারণ করতে পারে—একেই কন্‌ডেন্সারের ধারকত্ব (capacity) বলে। এই ধারকত্ব কন্‌ডেন্সারের ধাতুর পাত দুটির আয়তন এবং এদের ব্যবধানের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় পাত দুটির মাঝখানে অভ্রের মত কোনও অন্তরক (insulator) বসিয়ে আরও বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত কন্‌ডেন্সারে দুটি মাত্র পাতের পরিবর্তে দুই সারি পাত বসানো থাকে। কতকগুলি কন্‌ডেন্সার আবার এমন ভাবে তৈরী যাতে এক সারি পাত অন্য সারির উপর ঘুরিয়ে ধারকত্ব ক্রমশ কমানো বা বাড়ানো যায়—এদের পরিবর্তনশীল (variable) কন্‌ডেন্সার বলে। হাত দিয়ে ঘোরাবার জন্য এই সব কন্‌ডেন্সারে একটি হাতল বা knob থাকে।

মনে করা যাক্, ব্যাটারির সাহায্যে দুই পাতের কোনও কন্‌ডেন্সারে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করা হয়েছে। এই বিদ্যুতে পূর্ণ কন্‌ডেন্সারের পাত দুটি যদি

কোনও বেশী রোধের (resistance) তার বা তারের কুণ্ডলী দিয়ে পরস্পর যুক্ত করা হয় তবে দেখা যায় কন্‌ডেন্সারের ধনাত্মক পাতটি থেকে ঋণাত্মক পাতটিতে বিদ্যুৎ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু সংযোজক তারটির রোধ যদি কম হয়, অর্থাৎ তারটি যদি সুপরিবাহী হয়, তবে এক নতুন ব্যাপার দেখা যায়। তারটি যোগ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং নিমেষের মধ্যেই কন্‌ডেন্সারে বিদ্যুৎ-মোক্ষণ (discharge) হতে থাকে। এই বিদ্যুৎ-মোক্ষণ কালে তারটিতে পরিবর্ত্তী বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রবাহ বা বিদ্যুৎ-স্পন্দন দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাবেই সংযোজক তারে ও কন্‌ডেন্সারের ভিতর ক্ষণস্থায়ীবিদ্যুতের স্পন্দন হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় যদি বার বার নিয়মিত ভাবে এই কন্‌ডেন্সারটি বিদ্যুতে পূর্ণ করা যায় এবং প্রতিবারই যদি কোনও তারের কুণ্ডলী বা কয়েলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের মোক্ষণ সাধিত হয় তবে প্রতিবারই বিদ্যুৎ-মোক্ষণের সময় স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের স্পন্দন হবে তাতে সন্দেহ নাই। এইভাবে কয়েলের তারে একটির পর একটি অনেকগুলি ছাড়া-ছাড়া বিদ্যুতের স্পন্দন পাওয়া যায়। এই সব স্পন্দন যখন এরিয়েলের তারে সঞ্চারিত করা হয় তখনই সেই এরিয়েল থেকে পর পর অনেকগুলি বিলীয়মান বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্পার্ক-টেলিগ্রাফির প্রেরক-যন্ত্রে এই রকমের ব্যবস্থাই দেখা যায়।

কন্‌ডেন্সারের ধর্মই যখন বিদ্যুৎ-ধারণ, কন্‌ডেন্সার যে বিদ্যুৎ-মোক্ষণে বাধা দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কন্‌ডেন্সারের ধারকত্ব যত বেশী হয় এই বাধার পরিমাণও তত বেশী হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্যই দেখা যায়, বড় কন্‌ডেন্সারে বিদ্যুৎ-স্পন্দন ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে হয়, আর ছোট কন্‌ডেন্সারে স্পন্দন খুব দ্রুত হয়। এই বিদ্যুৎ-স্পন্দনের হার শুধু কন্‌ডেন্সারের উপরই নির্ভর করে তা নয়, যে তারের কুণ্ডলী বা কয়েল দিয়ে কন্‌ডেন্সারের পাত দুটি যোগ করা হয় সেই তারের কুণ্ডলী বা

কয়েলের এক বিশেষ গুণের উপরেও বিদ্যুৎ-স্পন্দনের হার অনেকখানি নির্ভর করে।

কয়েলের তারের এই গুণটির নাম—আবেশ (Inductance)। যখনই কয়েলে কোনও বিদ্যুৎ-প্রবাহ সুরু অথবা শেষ হয়, কিংবা তার দিক্-পরিবর্তন হয়, তারের আবেশ তখন এই প্রত্যেকটি কাজেই বাধা দেয়। অবশ্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ যখন একটানাভাবে চলে তখন এই সমপ্রবাহ বিশেষ বাধা পায় না—যেটুকু পায় তা কেবল কয়েলটির যৎকিঞ্চিৎ রোধের জন্য। আবেশকে সেজন্য পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহের রোধ বলা যেতে পারে। কাজেই কোনও কয়েলে বিদ্যুতের স্পন্দন হলে সে স্পন্দন মন্দীভূত হয়ে যায় এবং স্পন্দনের হার কয়েলের আবেশের উপর নির্ভর করে। কয়েলে যদি তার অনেক বার করে জড়ানো থাকে তবে কয়েলের আবেশ বেশী হয়। কয়েলের আকার ও আয়তনের উপরেও আবেশ নির্ভর করে। আবেশ বেশী হলে বিদ্যুতের স্পন্দন প্রতিপদে প্রতিহত হতে হতে মন্থর হয়ে যায়, আর আবেশ কম হলে স্পন্দন দ্রুত হয়। কাজেই বড় কন্‌ডেন্সার ও বড় কয়েল ব্যবহার করলে স্পন্দনের হার হয় কম, আর ছোট কন্‌ডেন্সার ও ছোট কয়েলে স্পন্দনের হার হয় বেশী। স্পন্দন দ্রুত হলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ছোট ও স্পন্দন মন্থর হলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বড় হয়—একথা আমরা জানি। সুতরাং বড় কন্‌ডেন্সার ও বড় কয়েল ব্যবহার ক'রে দীর্ঘ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আর ছোট কন্‌ডেন্সার ও ছোট কয়েল ব্যবহার ক'রে হ্রস্ব বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যায়। সাধারণত এই ভাবেই ছোট-বড় মাপের কন্‌ডেন্সার ও কয়েল ব্যবহার ক'রে প্রেরক-যন্ত্রের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ইচ্ছানুরূপ হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা হয়।

স্পার্ক-টেলিগ্রাফির প্রেরক-যন্ত্রের কথা সাধারণ ভাবে আগেই বলা হয়েছে। আর্ক-ট্রান্‌স্মিটার থেকে যে অবিচ্ছিন্ন ও সমবিস্তারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যায় তার নির্মাণ-রীতি সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। এতে ব্যাটারি

অথবা জেনারেটর (generator)-এর সাহায্যে আর্ক জ্বালানো হয়। আর্ক জ্বলার সঙ্গে সঙ্গেই আর্কের সহিত যুক্ত কয়েল ও কন্‌ডেন্সারে বিদ্যুতের স্পন্দন হতে থাকে। এই বিদ্যুৎ-স্পন্দনই এরিয়েলে সঞ্চারিত ক'রে স্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের তরঙ্গ পাওয়া যায়। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কয়েল ও কন্‌ডেন্সারের মাপের উপর নির্ভর করে। ডাইনামো-যন্ত্রের ব্যবস্থায় একটি বড় তড়িৎ-চুম্বক (electro-magnet) ব্যবহার করা হয়। চুম্বকের দুই মেরুর মাঝখানে লোহা কিংবা নিকেল-ক্রোমের (Nickel-chrome) বড় একটি চাকৃতি ঘুরিয়ে ডাইনামোর আরমেচারে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। এই ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে পরিবর্তী প্রবাহ বা বিদ্যুৎ-স্পন্দনের হার চাকৃতিটির দ্রুতির উপর নির্ভর করে। ডাইনামো-যন্ত্রে খুব বেশী উঁচু হারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন উৎপাদন করা সম্ভব নয়, কারণ চাকৃতিটির দ্রুতির এক উর্ধ্বতম সীমা থাকে। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ-স্পন্দন এরিয়েলে সঞ্চারিত ক'রে একটানা ও স্থায়ী বিদ্যুতের ঢেউ পাওয়া যায়।

ভাল্‌ভের সাহায্যে বিদ্যুৎ-স্পন্দন উৎপাদন করার নানারকম প্রণালী আছে। সব প্রণালীতেই মূল নীতিটি এক। একটি ত্রিপদী ভাল্‌ভ নেওয়া যাক্। অপেক্ষাকৃত বেশী ভোল্টের কোনও ব্যাটারির ধন-মেরু যদি ভাল্‌ভটির প্লেটে ও ঋণ-মেরু ফিলামেণ্টের এক প্রান্তে লাগানো যায়, আর ফিলামেণ্টের ভিতর দিয়ে যদি অন্য কোনও কম-ভোল্টের ব্যাটারির সাহায্যে বিদ্যুৎ চালনা করা হয় তবে ভাল্‌ভের ফিলামেণ্ট থেকে প্লেটে ইলেক্‌ট্রনের প্রবাহ হয়। বড় ব্যাটারির ধন-মেরু থেকে বিদ্যুৎ যেন প্লেটের দ্বার দিয়ে ভাল্‌ভে প্রবেশ করে এবং ভাল্‌ভের ভিতর দিয়ে ফিলামেণ্টে পৌঁছে আবার ঐ ব্যাটারির ঋণ-মেরুতে ফিরে যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের এই পথটিকে প্লেটের চক্রপথ বা প্লেট সার্কিট (plate circuit) বলা হয়। প্লেট ও ফিলামেণ্টের মাঝখানে ভাল্‌ভের

ভিতর যে গ্রিড থাকে—ফিলামেন্টের সঙ্গে এই গ্রিড পদটির একটি বাইরের যোগ থাকে। সাধারণত ভাল্‌ভের বাইরে কোনও কয়েল দিয়ে গ্রিড ও ফিলামেন্টে যোগ করা হয়। গ্রিড-ফিলামেন্টের চক্রপথেও বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়; কিন্তু প্লেটের চক্রপথে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয় তার তুলনায় গ্রিডের চক্রপথে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয় তা অতি সামান্য। প্লেট ও গ্রিড, এ দুয়ের চক্রপথ বা সার্কিট একে অন্যের উপর যাতে প্রভাব বিস্তার করে তার নানারকম ব্যবস্থা থাকে। কখনও কখনও প্লেটের চক্রপথে একটি কয়েল বসিয়ে সেই কয়েলটিকে গ্রিডের সহিত যুক্ত কয়েলটির কাছাকাছি বা পাশাপাশি বসানো হয়; কখনও-বা কোনও কন্‌ডেন্সারের মধ্য দিয়ে প্লেট ও গ্রিডের চক্রপথ পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। অনেক সময় আবার ভাল্‌ভের ভিতরকার প্লেট ও গ্রিডের মধ্য দিয়েই গ্রিড ও প্লেটের চক্রপথ একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি কোনও কারণে গ্রিডের কয়েলে ক্ষণিকের জন্যেও কোনও স্পন্দন হয়—এই ক্ষণিক স্পন্দন ভাল্‌ভের গুণে প্লেটের চক্রপথে বর্ধিত আকারে প্রকাশ পায়। এই স্পন্দনের প্রভাব আবার গ্রিডের কয়েলে গিয়ে পড়ে। গ্রিডের কয়েলের ক্ষণিক স্পন্দন মিলিয়ে না গিয়ে এই প্রভাবের ফলে যাতে সঞ্জীবিত ও সক্রিয় হয়ে উঠে, প্রেরক-যন্ত্রে সেই ব্যবস্থাই করা হয়। এখানে দোলনার দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। দোলনার দোল স্থায়ী ও দোলনের বিস্তার বড় করতে হলে দোলনায় নির্দিষ্টকাল পর পর কেবল ধাক্কা দিলেই হয় না—এই নিয়মিত ধাক্কা ঠিক সময়মত হওয়া চাই। প্রেরক-যন্ত্রেও তেমনি গ্রিডের কয়েলে প্রথম যে ক্ষণিক স্পন্দন হয় তাকে সঞ্জীবিত ও স্থায়ী করতে হলে প্লেটের চক্রপথ থেকে গ্রিডের কয়েলে বিদ্যুতের স্পন্দন শুধু সঞ্চারিত করাই যথেষ্ট নয়—এই সঞ্চারিত স্পন্দনও উপযুক্ত সময়মত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক ভাল্‌ভ-প্রেরক-যন্ত্রে মূলত এই ব্যবস্থাই করা হয়। এইভাবে

ভাল্‌ভের ভিতর স্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-স্পন্দন পাওয়া যায়। এই স্পন্দনই এরিয়েলে সঞ্চারিত ক'রে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভাল্‌ভ-প্রেরক যন্ত্রে সাধারণত প্লেট অথবা
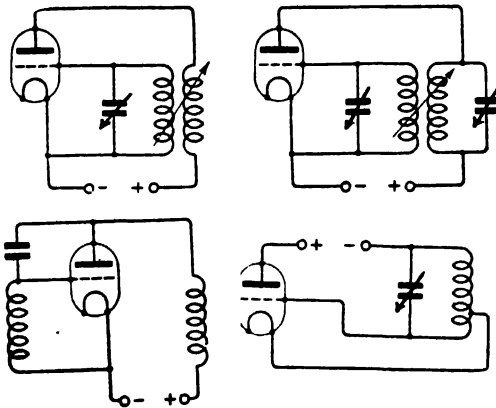
বিদ্যুৎ-স্পন্দন-উৎপাদক বিভিন্ন ভাল্‌ভ-সার্কিট

গ্রিডের সার্কিটে কয়েল ও কন্‌ডেন্সার সমান্তর ক'রে বসানো থাকে। এই কয়েল ও কন্‌ডেন্সারের মাপই মোটামুটিভাবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিরূপিত করে।

ভাল্‌ভ-প্রেরক-যন্ত্র থেকে যে বিদ্যুতের তরঙ্গ পাওয়া যায় তার দৈর্ঘ্য সব সময় সমান থাকে না। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন নানা কারণে হতে পারে। বেশীক্ষণ বিদ্যুৎ চলাচল হলে প্রেরক-যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। উত্তাপের ফলে কয়েলের প্রসারণ হয়। এতে কয়েলের আবেশ কিছু পরিবর্তিত হয়। আবার উত্তাপের ফলে কন্‌ডেন্সারের মাপ-জোঁকও কিছু বদলায়। তা ছাড়া ভাল্‌ভের প্লেট, গ্রিড ও ফিলামেণ্টে যে ভোল্টেজ দেওয়া হয় তা স্থির না থাকায় ভাল্‌ভের গুণের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনের ফলেও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য

কতকটা বদলায়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রধানত কয়েল ও কন্‌ডেন্সারের মাপের উপর নির্ভর করলেও ভাল্‌ভের গুণ ও প্রেরক-যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট এরিয়েল অথবা অন্য সার্কিটের উপরেও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অল্প পরিমাণে নির্ভর করে।

ভাল্‌ভ প্রেরক-যন্ত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সমান রাখবার জন্য সাধারণত তিন রকম ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রথম ব্যবস্থায় স্ফটিক (quartz)-ক্রস্ট্যাল ব্যবহার করা হয়। স্ফটিক ও অন্য কতকগুলি ক্রস্টালের এক বিশেষ গুণ আছে। এই সব ক্রস্টাল বিশেষ বিশেষ দিকে ছেদ ক'রে যদি তার কোনও দিকে বিদ্যুতের চাপ বা ভোল্‌টেজ প্রয়োগ করা হয় তবে বিশেষ দিকে ক্রস্টালের প্রসারণ হয়—আর ঠিক তার বিপরীত দিকে ভোল্‌টেজ দিলে সেই দিকেই আবার সংকোচন হয়। সুতরাং স্ফটিকের মত ক্রস্টালে যদি পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ অথবা বিদ্যুৎ-স্পন্দন চালনা করা যায় তবে ক্রস্টালটি কেঁপে ওঠে। এই কম্পন বা স্পন্দন ক্রস্টালটির স্বাভাবিক স্পন্দন নয়। বিদ্যুৎ-স্পন্দনের পাল্লায় ক্রস্টালটি বাধ্য হয়ে যেন কাঁপতে থাকে। যে বিদ্যুৎ-স্পন্দন ক্রস্টালে চালনা করা হয় তার স্পন্দন-সংখ্যা যদি ক্রস্টাল-খণ্ডটির স্বাভাবিক স্পন্দন-সংখ্যার সমান করা হয় তবে হয় অনুনাদ (resonance); তখন বেশী বিস্তারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন চলতে থাকে; আর ক্রস্টাল-খণ্ডটিও সমান হারে কাঁপতে থাকে। ক্রস্টাল-খণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন-সংখ্যা ক্রস্টালের স্থিতিস্থাপকতা ও খণ্ডটির মাপ-জোঁকের উপর নির্ভর করে। খণ্ড যদি ছোট হয় ক্রস্টালের স্বাভাবিক স্পন্দন-সংখ্যা হয় বেশী, আর খণ্ড যদি বড় হয় তবে তার স্বাভাবিক স্পন্দন-সংখ্যা হয় কম। ক্রস্টালের এই স্পন্দনের হার শব্দের দ্রুততম হার অপেক্ষা অনেক অধিক—কানে তার কোনও সাড়াই পাওয়া যায় না। এজন্য এই সব স্পন্দনকে শব্দাতীত স্পন্দন বা ultra-sonics বলা হয়। ক্রস্টালের এই শব্দাতীত স্পন্দনের হার উষ্ণতার সঙ্গে খুব

বেশী বদলায় না। প্রেরক-যন্ত্রের সার্কিটে এমন মাপের ক্রিস্টাল খণ্ড ব্যবহার করা হয় যার স্বাভাবিক স্পন্দন-সংখ্যা প্রেরক-যন্ত্রের স্পন্দন-সংখ্যার সমান। এই বিশেষ মাপের ক্রিস্টালের খণ্ড ভাল্‌ভ-সার্কিটের যথাস্থানে বসিয়ে ছোট একটি বাক্সে বন্ধ রাখা হয়। বাক্সের ভিতর উষ্ণতা সমান রাখবার ব্যবস্থা থাকে। বিদ্যুৎ-স্পন্দন ক্রিস্টালের মধ্যে সঞ্চারিত হলেই ক্রিস্টালের খণ্ডটি কাঁপতে থাকে ও বিদ্যুৎ-স্পন্দনের হার ঐ খণ্ডটির স্বাভাবিক স্পন্দন-সংখ্যার সমান নির্দিষ্ট হয়ে যায়। স্পন্দন-সংখ্যা নির্দিষ্ট হলেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও নির্দিষ্ট হয়। ১৯২২ সনে কাডি (Cady) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমতা রক্ষার এই ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করেন।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সমান রাখবার দ্বিতীয় ব্যবস্থায় দ্বিদন্তক শব্দ-যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। এই শব্দ-উৎপাদক যন্ত্রটিকে ইংরেজিতে tuning fork বলে। ইস্পাতের একটি দণ্ড ইংরেজি U-অক্ষরের মত বাঁকানো থাকে এবং বাঁকানো অংশের নীচে একই উপাদানের একটি হাতল লাগানো হয়। বাঁকান দণ্ডটির দুই প্রান্তে ঘা দিয়ে শব্দ উৎপাদন করা যায়। সাধারণত তারে, দণ্ডে বা পাতে ঘা দিলে মূল স্বরের (fundamental tone) সঙ্গে উঁচু কতকগুলি স্বর অল্প পরিমাণে বেরোয়—এদের ঊর্ধ্বগ স্বর (overtone) বলে। এরকম বাঁকানো দণ্ডে আঘাত করলে কেবল মূল স্বরটিই পাওয়া যায়—ঊর্ধ্বগ স্বরগুলি আঘাত করার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। দ্বিদন্তক শব্দ-যন্ত্র থেকে সেজন্য বিশুদ্ধ ধ্বনি পাওয়া যায়। এর স্পন্দনের হার এর উপাদান ও মাপ-জোঁকের উপর নির্ভর করে। ইস্পাতের সঙ্গে অল্প একটু নিকেল মিশিয়ে দণ্ডটি তৈরি করলে দেখা যায় যে এর স্পন্দনের হার উষ্ণতার সঙ্গে বিশেষ বদলায় না। এই দ্বিদন্তক যন্ত্রটি ভাল্‌ভের সাহায্যে সহজেই কাঁপানো যায়। ভাল্‌ভে যে বিদ্যুতের স্পন্দন উৎপাদন

করা হয় তার স্পন্দন-সংখ্যা দ্বিদন্তক দণ্ডটির স্বাভাবিক কম্পন-সংখ্যার সমান করা হয়। এই স্বাভাবিক কম্পনই ভাল্‌ভের বিদ্যুৎ-স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রিত করে। দ্বিদন্তক যন্ত্রটির কম্পন-সংখ্যা উষ্ণতার পরিবর্তন সত্ত্বেও সমান থাকে ব'লে ভাল্‌ভের বিদ্যুৎ-স্পন্দনও সমান হারে চলতে থাকে। এই বিদ্যুৎ-স্পন্দনের হার শব্দের কম্পন-সংখ্যার মত নিতান্তই কম। প্রেরক-যন্ত্রে অবশ্য খুব উঁচুহারের স্পন্দন দরকার—সেজন্য এক বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হয়। তারে ছড় টান্‌লে বা টংকার দিলে যেমন মূল সুরের সঙ্গে কতকগুলি ক্ষীণ উর্ধ্বগ সুর বেরোয়, তেমনি ভাল্‌ভ-প্রেরক-যন্ত্রেও বিদ্যুতের মূল স্পন্দনের সঙ্গে অনেকগুলি উর্ধ্বগ স্পন্দন ক্ষীণভাবে হতে থাকে। এই সব উর্ধ্বগ স্পন্দনের হার মূল স্পন্দনের দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ, পাঁচগুণ ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন উঁচুহারের স্পন্দন থেকে যদি কোনও একটি বিশেষ স্পন্দন বেছে নেওয়া হয় যার হার মূল স্পন্দনের ১০ কি ৫০ গুণ, তবে এই স্পন্দনকে বাড়িয়ে নিয়ে এরিয়েলের তারে সঞ্চারিত করলে খুব উঁচুহারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যায়।

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সমান রাখবার তৃতীয় ব্যবস্থায় ভাল্‌ভ-প্রেরক-যন্ত্রে কয়েল ও কন্‌ডেন্সার প্রতিবিম্বিত অবস্থায় রাখা হয়। উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে কয়েলের আবেশ পরিবর্তনের জন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যা বদ্‌লায়, কনডেন্সার পরিবর্তনের জন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন এই ব্যবস্থায় ঠিক তার সমান অথচ বিপরীত করা হয়; ফলে উষ্ণতার পরিবর্তন হলেও বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ঠিকই থাকে। তাছাড়া, প্রেরক-যন্ত্রে এমন সব ব্যবস্থা করা হয় যাতে ভাল্‌ভের প্লেট, ফিলামেণ্ট প্রভৃতির জন্য যে ভোল্‌টেজ দরকার হয় তা অনেকটা স্থির থাকে। ফ্রাঙ্কলিন (Franklin) ও উইট্ (Witt)-এর ব্যবস্থা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রেরক-যন্ত্রের বিদ্যুৎ-স্পন্দন এরিয়েলে কি ক'রে সঞ্চারিত করা হয় এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রেরক-যন্ত্রের যে সার্কিটে বিদ্যুৎ-স্পন্দন

হয়, সেই সার্কিটের কয়েলের এক প্রান্ত প্রেরক-যন্ত্রের যে সার্কিট বিদ্যুৎ-স্পন্দন হয় সেই সার্কিটের কয়েলের এক প্রান্ত এরিয়েলের সংযোজক তারে সোজাসুজি যোগ ক'রে দেওয়া হয় ; সাধারণত মাটির সহিত কয়েলের অন্য প্রান্তটির যোগ থাকে। কখনও কখনও কনডেন্সারের মধ্যস্থতায় প্রেরক-যন্ত্রের বিদ্যুৎ-স্পন্দন এরিয়েলে সঞ্চারিত করার ব্যবস্থা করা হয়। আবার কখনও কখনও ট্রান্‌স্‌ফর্মার (transformer) যন্ত্রের সাহায্যে এরিয়েলে বিদ্যুৎ-স্পন্দন চালনা করা হয়। বেতারের কাজে ট্রান্‌স্‌ফর্মার একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ বা যন্ত্র। এতে দুটি তারের কুণ্ডলী বা কয়েল থাকে— একটি আর একটির উপর জড়ানো থাকে। সময় সময় কয়েল দুটি পাশাপাশিও বসানো থাকে। এদের একটিকে মুখ্য বা প্রাইমারি ও অন্যটিকে সেকেণ্ডারি কয়েল বলা হয়। প্রাইমারি কয়েলে বিদ্যুতের স্পন্দন বা পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহের চলাচল হলে, সেকেণ্ডারি কয়েলেও অনুরূপ স্পন্দন বা পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়। কতকগুলি ট্রান্‌সফর্মারে এমন ব্যবস্থা থাকে যে প্রাইমারি কয়েলে যখন পরিবর্তী প্রবাহের ভোল্‌টেজ দেওয়া হয় সেকেণ্ডারি কয়েলে তখন তার চেয়ে অনেক বেশী ভোল্‌টেজ সঞ্চারিত হয়। কতকগুলি ট্রান্‌স্‌ফর্মারে আবার এর বিপরীত ব্যবস্থা থাকে। প্রেরক-যন্ত্রের যে সার্কিটে বিদ্যুতের স্পন্দন হয় সেই সার্কিটের কয়েল যদি কোনও উপযুক্ত ট্রান্‌স্‌ফর্মারের প্রাইমারি কয়েল হিসাবে ব্যবহার করা যায় তবে তার সেকেণ্ডারি কয়েল এরিয়েলের তারে জুড়ে দিলে প্রেরক-যন্ত্রের কয়েল থেকে বিদ্যুতের স্পন্দন সহজেই এরিয়েলের তারে সঞ্চারিত করা যায়।

বেতার-প্রেরক-কেন্দ্রের কথা

বেতার-প্রেরক-কেন্দ্রের প্রথম ও প্রধান কাজ, উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন উৎপাদন। দ্বিতীয় কাজ, গান বা কথার নীচুহারের কম্পনকে অনুরূপ হারের বিদ্যুৎ-স্পন্দনে পরিবর্তন। এবং তৃতীয় কাজ, এই উঁচু ও নীচুহারের দু'রকম বিদ্যুৎ-স্পন্দনের যথাযথ সংমিশ্রণ ও এই মিশ্র স্পন্দন এরিয়েলের তারে সঞ্চারিত ক'রে তা থেকে মিশ্র বা বিকৃত (modulated) বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উৎপাদন।

গান বা কথাকে কি ক'রে বিদ্যুৎ-প্রবাহে পরিণত করা হয় তা প্রথমে বলে নিয়ে বেতার-প্রেরক-কেন্দ্রের অন্য কথা পরে বর্ণনা করব। ধ্বনিকে বিদ্যুতের শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে মাইক্রোফোন-যন্ত্রের দরকার। মাইক্রোফোন নানা প্রকারের হয়। কার্বন-মাইক্রোফোনে (carbon microphone) কার্বনের চূর্ণ থাকে এবং একটি পাতলা ধাতুর পর্দা বা পাত এমনভাবে বসানো থাকে যার সামনে কথা বললে কিংবা গান গাইলে এই পর্দাটি কাঁপতে থাকে। এই কম্পনের ফলে কার্বন-চূর্ণের
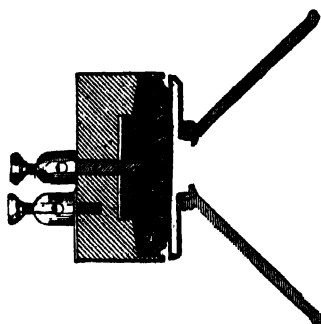
কার্বন-মাইক্রোফোন (carbon microphone)

উপর কথা বা গানের জোর অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণের চাপ পড়ে। কার্বন-চূর্ণে বিভিন্ন পরিমাণে চাপ পড়লে এর বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা চাপ

অনুযায়ী কমে ও বাড়ে। ছোট একটি ব্যাটারি থেকে সমপ্রবাহ কার্বন-চূর্ণের ভিতর দিয়ে চালনা করা হয়। কার্বন-চূর্ণের উপর চাপের তারতম্য অনুসারে এর পরিবাহিতা বদলায় বলে মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎ-প্রবাহও কথা বা গানের জোর অনুসারে কখনও বাড়ে, কখনও কমে। এইভাবেই শব্দের কম্পন থেকে নীচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন পাওয়া যায়। আজকাল আর একরকম মাইক্রোফোনের ব্যবহার খুবই প্রচলিত দেখা যায়— একে চলমান কয়েল-মাইক্রোফোন (moving coil microphone) বলে। এই মাইক্রোফোনে একটি চুম্বকের শক্তি-ক্ষেত্রে ছোট একটি তারের কুণ্ডলী বা কয়েল এমনভাবে বসানো থাকে যে কথা বললে বা গান গাইলেই বাতাসের চাপে কয়েলটি শব্দের জোর অনুসারে নড়তে থাকে। চুম্বক শক্তির ক্ষেত্রে কোনও পরিবাহী বস্তু যদি নড়ে বা সরে, তবে তড়িৎ-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে ঐ পরিবাহী বস্তুটির ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার হয়। কাজেই মাইক্রোফোনের কয়েলটি যখন কথা বা গানের সঙ্গে সঙ্গে নড়তে থাকে তখন এই কয়েলে শব্দের জোর অনুযায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহ হতে থাকে। এই চলমান কয়েল-মাইক্রোফোনের পরিবর্তিত সংস্করণই রিবন
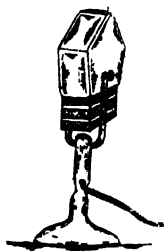
আধুনিক রিবন (ribbon)-মাইক্রোফোন

(ribbon)-মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোনে কয়েলের বদলে একটি সরু, পাতলা ও লম্বা এবং উঁচু-নীচু খাঁজ-কাটা এলিউমিনিয়ামের পাত বা রিবন

একটি U-আকারে বাঁকানো চুম্বকের মেরু দুটির মাঝখানে লাগানো থাকে। এর সাম্‌নে কথা বা গান হ'লে এই রিবন কাঁপতে থাকে। ফলে এর মধ্যে নীচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন হয়। চলমান কয়েল-মাইক্রোফোন বা এই জাতীয় মাইক্রোফোনের ঠিক সাম্‌নে বা এ-পাশে ও-পাশে শব্দ করলে ফল সমান হয় না; সেজন্য সুবিধা এই যে, ঐকতান বাদ্যের সময় যে বাদ্য-যন্ত্রের জোর বেশী সেটিকে মাইক্রোফোনের এক পাশে ও যার জোর খুব কম সেটিকে ঠিক সাম্‌নে রেখে ঐকতান বাদ্যের পরিচালনা করা হয়। রিবন-মাইক্রোফোনে দুই দিক্ থেকে কথা বলা বা গান গাওয়া যায়। কিন্তু কোনও কোনও যন্ত্রে এক দিক্ বন্ধ করা থাকে—এ ক্ষেত্রে মাইক্রোফোনের সব দিক্ থেকেই সমান ফল হয়। কন্‌ডেন্সারের তৈরি একরকম মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয়— একে কন্‌ডেন্সার-মাইক্রোফোন বলে। ক্রস্টাল-মাইক্রোফোনও আজকাল প্রচলিত হয়েছে; বিশেষ বিশেষ ক্রস্টাল দিয়ে এগুলি তৈরি করা হয়। কার্বন-মাইক্রোফোন, কন্‌ডেন্সার-মাইক্রোফোন ও ক্রস্টাল-মাইক্রোফোনে সব দিক্ থেকে শব্দ হলে সমান ফলই পাওয়া যায়।

স্টুডিয়ো-ঘর বিশেষ যত্নের সহিত নির্মিত হয়। বাইরে থেকে কোনও শব্দ স্টুডিয়োর ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। স্টুডিয়ো-ঘরের দেয়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে শব্দ যাতে মাইক্রোফোনে প'ড়ে শব্দের বিকৃতি ও গোলযোগ না ঘটায় সেজন্য শব্দ-শোষক বিশেষ বস্তু দিয়ে স্টুডিয়োর দেয়াল, দরজা, ছাদ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। মাইক্রোফোনের নীচু-হারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন বিবর্ধক-যন্ত্রের সাহায্যে অনেক গুণ বাড়িয়ে নেওয়া হয়। স্টুডিয়োর কাছেই কন্‌ট্রোল-ঘর থাকে। বক্তৃতা বা গানের সবটাই যাতে মোটামুটি সমান জোরে শোনা যায়, কন্‌ট্রোল ঘরে ব'সে বেতার-কর্মী সেজন্য কথা বা গানের বিবর্ধিত বিদ্যুৎ-স্পন্দনে সমতা আন্‌তে চেষ্টা করেন। এই সমান-জোরের বিবর্ধিত বিদ্যুৎ-স্পন্দনই টেলিগ্রাফের

তারের সাহায্যে প্রেরক কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। প্রেরক কেন্দ্রে পাঠাবার পরেও এই বিবর্ধিত স্পন্দনকে আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা থাকে।

প্রেরক-কেন্দ্রের প্রধান কথা উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন সৃষ্টি করা। প্রথমত অল্প শক্তির ছোট একটি ভাল্‌ভের সার্কিটে বিদ্যুৎ-স্পন্দন উৎপাদন করা হয়। এই স্পন্দনের হার সমান রাখবার জন্য স্ফটিক-ক্রস্টাল কিংবা দ্বিদন্তক শব্দ-যন্ত্র (tuning fork) কিংবা ফ্রাঙ্কলিনের ব্যবস্থার মত কোনও ব্যবস্থা থাকে। কোনও কোনও স্থলে বিদ্যুৎ-স্পন্দনের হার ভাল্‌ভের সাহায্যে দু গুণ বা চার গুণ করে নেবার বন্দোবস্ত দেখা যায়। এই উঁচুহারের স্পন্দন আরও কতকগুলি ভাল্‌ভের সাহায্যে আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে নিয়ে কথা বা গানের বিবর্ধিত বিদ্যুৎ-স্পন্দনের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্র স্পন্দনই এরিয়েলে চালনা ক'রে মিশ্র বা বিকৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যায়।

সাধারণত প্রেরক-যন্ত্রে যে উঁচু ও নীচুহার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের মিশ্রণ হয় তাকে বিস্তারগত বিকৃতি (amplitude modulation) বলে, কেননা মিশ্র বা বিকৃত তরঙ্গে বিস্তারের তারতম্য লক্ষিত হয়। এই ধরণের বিকৃত তরঙ্গ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাহক-তরঙ্গ ছাড়াও এতে আরও দুটি তরঙ্গ থাকে—যাদের পার্শ্ব-তরঙ্গ (side-bands) বলা হয়। পার্শ্ব-তরঙ্গ দুটির স্পন্দন-সংখ্যা উঁচু ও নীচুহার স্পন্দনের স্পন্দন-সংখ্যার যোগ ও বিয়োগফলের সমান। ভাল গ্রাহক-যন্ত্রে বাহক-তরঙ্গের দু-পাশে পার্শ্ব-তরঙ্গ দুটির সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিস্তারগত বিকৃতি বা মডিউলেশন নানা ভাবে সম্ভব। অল্প শক্তির প্রেরক-কেন্দ্রে এরিয়েলের সঙ্গেই মাইক্রোফোন যুক্ত ক'রে কথা বা গানের স্পন্দন এরিয়েলের উঁচুহার স্পন্দনের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার নাম এরিয়েল-মডিউলেশন। প্রেরক-যন্ত্রে যে

ভাল্‌ভে উঁচু হারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন হয় সেই ভাল্‌ভেরই গ্রিড-সার্কিটের উপর কখনও কখনও মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎ-স্পন্দন চাপিয়ে দেওয়া হয়; ফলে গ্রিড-সার্কিটে মিশ্র স্পন্দন হতে থাকে ও ভাল্‌ভের গুণে এই মিশ্র স্পন্দন প্লেট-সার্কিটে বর্ধিত আকারে প্রকাশ পায়। প্লেট-সার্কিট থেকে এই মিশ্র স্পন্দনই এরিয়েলে চালনা করা হয়। মডিউলেশনের এই ব্যবস্থার নাম গ্রিড-মডিউলেশন। অনেক সময় আবার স্পন্দন-উৎপাদক ভাল্‌ভের প্লেট-সার্কিটেই মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎ স্পন্দন প্রয়োগ করা হয়। মডিউলেশনের এই ব্যবস্থাকে প্লেট-মডিউলেশন বলে।

প্লেট-মডিউলেশন নানা রকমের হতে পারে। হাইসিং (Heissing)-এর প্রণালী এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একে সময় সময় choke-control-প্রণালী-বলা হয়। Series modulation-ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বেতার-ট্রান্‌স্‌মিটারগুলিতে সচরাচর যে ব্যবস্থা দেখা যায় তার নাম বি-শ্রেণীর প্লেট-মডিউলেশন (Class B plate modulation)।

আমাদের দেশে অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও (এ-আই-আর) পরিচালিত অনেকগুলি বেতার-কেন্দ্র আজ কাজ করছে। দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই কেন্দ্রগুলিতে হ্রস্ব-তরঙ্গের প্রেরক-যন্ত্র আছে। হ্রস্ব-তরঙ্গের যন্ত্রগুলি প্রায় সবই ১০ কিলো-ওয়াট (kilo-watt) শক্তির। দিল্লীতে সম্প্রতি ১০০ কিলো-ওয়াটের দুইটি হ্রস্ব-তরঙ্গের প্রেরক-যন্ত্র নির্মিত হয়েছে। ১০ ও ৭½ কিলো-ওয়াটের প্রেরক-যন্ত্রও দিল্লীতে আছে। হ্রস্ব-তরঙ্গের কেন্দ্রগুলি থেকে ১৯ হতে ৯০ মিটারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ভারতবর্ষে দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ঢাকা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, পেশাওয়ার ও ত্রিচিনপল্লীতে এ-আই-আর-এর মধ্যম-তরঙ্গের ৯টি প্রেরক-কেন্দ্র আছে। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের যন্ত্রগুলির প্রত্যেকটি ১½

কিলো-ওয়াটের। মধ্যম-তরঙ্গের অন্য প্রেরক-কেন্দ্রগুলির প্রায় সবই ৫ কিলো-ওয়াটের। এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ২০০ থেকে ৫০০ মিটার।

এ-আই-আর-এর হ্রস্বতরঙ্গের ১০ কিলো-ওয়াট স্টেশন ও মধ্যম-তরঙ্গের ৫ কিলো-ওয়াট স্টেশনগুলির সংখ্যাই বেশী। সেজন্য এদের সম্বন্ধে কিছু বলা সমীচীন। হ্রস্ব ও মধ্যম-তরঙ্গের এই দুই প্রেরক-কেন্দ্রেই স্টুডিয়ো থেকে আনীত কথা ও গানের বিদ্যুৎ-স্পন্দন, সাব-সাব-মডিউলেটার (sub-sub-modulator), সাব-মডিউলেটার (sub-modulator) ও মডিউলেটার (modulator)—এই তিন দফায় প্রায় ১ কোটি গুণ বাড়ানো হয়। এই বিবর্ধিত বিদ্যুৎ-স্পন্দন মাইক্রো-ফোনের বিদ্যুৎ-স্পন্দনের প্রায় ১ লক্ষ কোটি গুণ দাঁড়ায়। মডিউলেটারে ৪টি বড় বড় ভাল্‌ভ থাকে—জল বা হাওয়া চালনা ক'রে ভাল্‌ভগুলি ঠাণ্ডা রাখা হয়। হ্রস্ব-তরঙ্গের ১০ কিলো-ওয়াট স্টেশনে প্রথম ভাল্‌ভে যে উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন সৃষ্টি করা হয় তার শক্তি ১ ওয়াট মাত্র। স্পন্দনের হার সমান রাখার জন্য এই ভাল্‌ভেরই সার্কিটে যথাস্থানে স্ফটিক-ক্রস্টাল ব্যবহার করা হয়। এই স্পন্দনই তিন দফায় ভাল্‌ভের সাহায্যে প্রায় ১০ হাজার গুণ বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এর পর ভাল্‌ভের সাহায্যেই আবার স্পন্দনের হার চতুর্গুণ করে নেবার ব্যবস্থা থাকে। তার পরই থাকে বেশী শক্তির বিবর্ধকের বন্দোবস্ত। এতে ৪টি বড় বড় ভাল্‌ভ ব্যবহার করা হয়। এদের প্লেট-সার্কিটে কয়েল থাকে। এই কয়েলেই উঁচু ও নীচুহারের স্পন্দন মিলে বি-শ্রেণীর মডিউলেশন সাধিত হয়। মধ্যম-তরঙ্গের স্টেশনেও প্রথম ভাল্‌ভে যে বিদ্যুৎ-স্পন্দন হয় তার হার স্ফটিক-ক্রস্টালের সাহায্যে ঠিক রাখা হয়। এর পরই স্পন্দনের হার চারগুণ করে নেবার বন্দোবস্ত থাকে। তারপর তিন দফায় এই উঁচু হারের স্পন্দন বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এর পরেই থাকে বেশী শক্তির বিবর্ধকের ব্যবস্থা।

মধ্যম তরঙ্গের স্টেশনে এই ব্যবস্থা হ্রস্ব-তরঙ্গের স্টেশনেরই অনুরূপ। বড় ভাল্‌ভগুলির প্লেটে ৮-১০ হাজার ভোল্‌ট প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

এ-আই-আর-এর মধ্যম-তরঙ্গের প্রেরক-যন্ত্রের বিশেষত্ব এদের এরিয়েল। ১৮০ ফুট উঁচু ইস্পাতের তৈরি এই এরিয়েলের ছবি প্রদর্শিত হ'ল। সাধারণত এরিয়েল খাটাতে হলে লোহার স্তম্ভ বা mast প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই এরিয়েলে ইস্পাতের স্তম্ভই এরিয়েলের কাজ
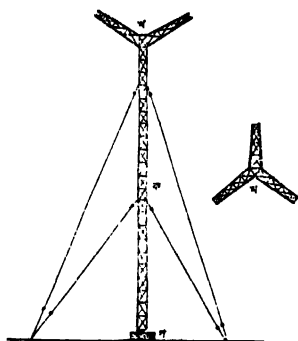
মধ্যম-তরঙ্গ-প্রেরক-কেন্দ্রের খাড়া এরিয়েল—(ক) স্টীলের স্তম্ভ বা মাস্ট (mast)। (খ) উপরে তিন দিকে বিস্তৃত বাহুত্রয়। (গ) অন্তরক (insulator)।

করে। এরিয়েলটি উপরে তিন দিকে একটু বিস্তৃত থাকে। এতে এরিয়েলের ধারকত্ব (capacity) বেশী হয়। এরিয়েলের নীচে চীনামাটি বা পোর্স্‌লেন (porcelain) বসিয়ে এরিয়েলটিকে মাটি থেকে বিশেষভাবে আল্‌গা রাখা হয়। এই ধরণের এরিয়েল থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চারদিকে সমানভাবে সংক্রমিত হয়। এরিয়েলের ঠিক নীচ থেকে অনেকগুলি তার চারদিক্‌কার জমির নীচে বিস্তৃতভাবে পাতা থাকে আর এই তারের প্রান্তগুলি মাটির সহিত বেশ ভালভাবে যুক্ত করা হয়।

হ্রস্ব-তরঙ্গের প্রেরক-যন্ত্রে এরিয়েল খুব বেশী বড় হয় না। মাটি থেকে এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্ধেক উচুঁতে, দুইটি সমান লম্বা অনুভূমিক তার, মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁক রেখে এক সরল রেখায় খাটানো থাকে। দুটি তার মিলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঠিক অর্ধ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান করা হয়। ফাঁকের জায়গায় তার দুটির প্রান্ত থেকে এক জোড়া তার নামিয়ে এনে প্রেরক-যন্ত্রের যথাস্থানে যোগ করা হয়ে থাকে। হ্রস্ব-তরঙ্গের এরিয়েল খাড়া ভাবেও খাটানো যায়।

বেতার-প্রেরক-যন্ত্রের প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। যে-সব ত্রিপদী ভাল্‌ভ উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন বিবর্ধিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাদের গ্রিড ও প্লেটের ভিতর দিয়ে গ্রিড-সার্কিট ও প্লেট-সার্কিটে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এর ফলে ভাল্‌ভে নতুন করে বিদ্যুৎ-স্পন্দন হবার আশঙ্কা থাকে। বিবর্ধনের কাজে এতে ব্যাঘাত হয়। সাধারণত উপযুক্ত মাপের পরিবর্তনশীল কন্‌ডেন্সার যথাস্থানে ব্যবহার ক'রে এর প্রতিবিধান করা হয়ে থাকে। এই কন্‌ডেন্সারকে প্রতিষেধক কন্‌ডেন্সার (neutralising condenser) বলে। প্রেরক-যন্ত্রে প্রতিষেধক কন্‌ডেন্সারের হাতলগুলি সহজেই সকলের নজরে পড়ে।

ভারতবর্ষে ব্রডকাস্টিং ব্যতীত বেতার-টেলিগ্রাফি ও বেতার-টেলিফোনির একটি বড় কেন্দ্র পুনার নিকট কির্কি (Kirkee)-তে আছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার অসংখ্য বেতার-কেন্দ্রের মধ্যে ইংলণ্ডের কয়েকটি প্রেরক-কেন্দ্রের কথা অতি সংক্ষেপে এখানে কিছু বল্‌ব। ইংলণ্ডের রাগবিতে ব্রিটিশ পোস্ট অফিসের যে বেতার-টেলিগ্রাফির জন্য ৫৪০ কিলোওয়াটের ও বেতার-টেলিফোনির জন্য ২০০ কিলো-ওয়াটের দীর্ঘ তরঙ্গের ট্রান্‌স্‌মিটার আছে তা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। রাগবিতে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সমান রাখা হয় দ্বিদস্তক শব্দ-যন্ত্রের সাহায্যে। এই দ্বিদস্তক যন্ত্রটি কাঁপাবার জন্য ৬টি ভাল্‌ভ থাকে। প্রথম ভাল্‌ভের প্লেটে ১২০

ভোল্ট ও ফিলামেণ্টে বিদ্যুৎ চলাচলের জন্য ৬ ভোল্ট ব্যবহার করা হয়। এই ভাল্ভের বিদ্যুৎ-স্পন্দন দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাল্ভের সাহায্যে অনেকগুণ বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এই দুই ভাল্ভের প্লেটে ও ফিলামেণ্টে প্রথম ভাল্ভের মতই কম ভোল্টেজ থাকে। এর পরের ব্যবস্থাটিকে 'পরিস্রুতি'-যন্ত্র বলা যেতে পারে। ইংরেজিতে একে filter বলা হয়। ভাল্ভের মূল বিদ্যুৎ-স্পন্দনের সঙ্গে আরও অনেক উর্ধ্বগ হারের স্পন্দন হয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই পরিস্রুতি-ব্যবস্থায় ইচ্ছানুরূপ বিশেষ কোনও উর্ধ্বগ হারের স্পন্দন যেন ছেঁকে নেওয়া হয়। রাগবি স্টেশনে সাধারণত নবম উর্ধ্বগ হারের স্পন্দনটিকে এইভাবে কাজে লাগানো হয়। তিনটি বড় বড় ভাল্ভ এই উর্ধ্বগ স্পন্দনকে অনেকগুণ বিবর্ধিত করে। এই ভাল্ভগুলির প্লেটে প্রায় ১ হাজার ভোল্ট প্রয়োগ করা দরকার হয়। প্রথম ভাল্ভে যে বিদ্যুতের স্পন্দন হয় শেষ পর্যন্ত এরিয়েলে স্পন্দনের জোর প্রায় তার ১০ হাজার কোটি গুণ দাঁড়ায়। রাগবিতে দীর্ঘ-তরঙ্গ প্রেরক-যন্ত্রের বিরাট এরিয়েল দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাগবির প্রেরক-যন্ত্র লণ্ডনের টেলিগ্রাফ অফিস থেকেই চালাবার ব্যবস্থা আছে।

এসেক্স (Essex)-এ ব্রেণ্টউড্ (Brentwood)-এর নিকট ওঙ্গার (Ongar)-এ যে বেতার-স্টেশন আছে তা প্যারিস, বার্ণ (Berne), বেলগ্রেড, মস্কৌ, বার্সিলোনো, মাদ্রিদ প্রভৃতি স্থানে বেতার-বার্তা পাঠাবার জন্য। ওঙ্গারের প্রেরক-যন্ত্রও লণ্ডন থেকে চালানো হয়।

উর্স্টারশায়রে (Worcestershire) ড্রয়টউইচ্ (Droitwitch)-এ যে বি-বি-সি'র ধ্বনি-বিস্তার কেন্দ্র আছে সেখানে দুটি প্রেরক-যন্ত্র আছে। যেটি ১৫০০ মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সেটি খুব বেশী শক্তির ও সমগ্র ইংলণ্ড ও ওয়েল্স্-এর জন্য কাজ করে। অন্যটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ২৯৬ মিটার এবং এর শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। ইংলণ্ডের মিড্ল্যাণ্ড্সের

জন্যই এটি নির্মিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ডাভেন্‌ট্রি (Daventry)-তে সবশুদ্ধ ছয়টি প্রেরক-যন্ত্র আছে। এদের মধ্যে তিনটি ৫০ কিলো-ওয়াটের, দুটি ১০ কিলো-ওয়াটের ও একটি ২৫ কিলো-ওয়াটের। সব কয়টিই হ্রস্ব-তরঙ্গের প্রেরক-যন্ত্র।

এখানে বলা প্রয়োজন যে বেতার-কেন্দ্রগুলিতে প্রেরক-যন্ত্রের সঙ্গে যে এরিয়েল ব্যবহার করা হয় তা সব ক্ষেত্রেই একক এরিয়েল নয়। ভিন্ন ভিন্ন হ্রস্ব তরঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন একক এরিয়েল যেমন ব্যবহার করা হয়, বিশেষ বিশেষ দিকে বেতার-তরঙ্গ পাঠাবার উদ্দেশ্যে তেমনি এরিয়েলের সারি (array) হ্রস্ব-তরঙ্গের অনেক প্রেরক-যন্ত্রে আজকাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এরিয়েল ও এরিয়েলের সারি

এরিয়েল যত উঁচু হয় ততই তা কার্যকরী হয়। বেতার-প্রেরক বা গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে যে-সব একক এরিয়েল ব্যবহার করা হয় সেগুলি নানা প্রকারের হতে পারে, যথা—

(১) খাড়া এরিয়েল :—এই এরিয়েল সবচেয়ে সরল। এর বিশেষত্ব এই যে প্রেরক-যন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এরিয়েলের সব দিকেই সমানভাবে সঞ্চারিত হয়, আর গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহার করলে সব দিক থেকেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ঠিক সমান ভাবে এই এরিয়েলে গৃহীত হয়।

(২) T-এরিয়েল :—খাড়া এরিয়েলের মাথায় দুদিকে সমান দৈর্ঘ্যের অনুভূমিক তার খাটালেই হয় T-এরিয়েল। ইংরেজি T-অক্ষরের মত দেখায় বলে এই নামকরণ হয়েছে। অনুভূমিক তারের মাঝখান থেকে

খাড়া ভাবে যে তার নেমে আসে এই তারই প্রেরক কিংবা গ্রাহক-যন্ত্রে লাগানো হয়। অনেক সময় কতকগুলি অনুভূমিক তার পাশাপাশি সমান্তরাল ক'রে খাটানো হয় ও প্রত্যেক তারের মাঝখান থেকে সংযোজক তার একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে মাটির দিকে খাড়াভাবে নামিয়ে নেওয়া হয়।

T-এরিয়েল থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেমন সমান ভাবে সংক্রমিত হয় তেমনি এতে সব দিক থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সমান ভাবে গৃহীতও হয়।
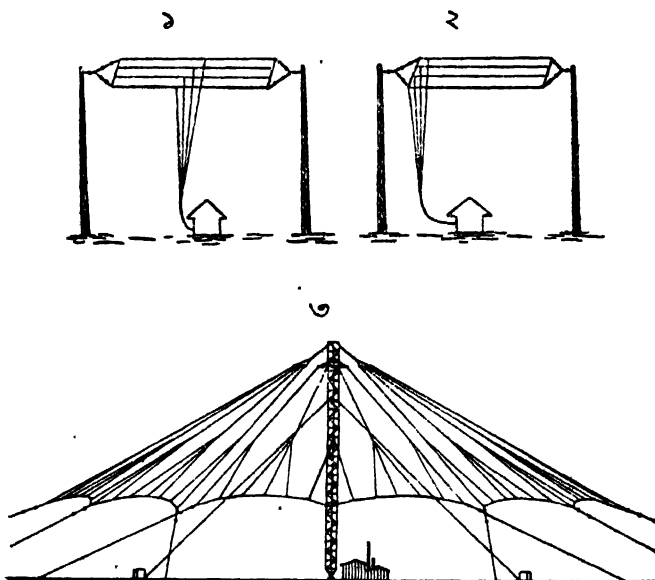
বিভিন্ন প্রকার এরিয়েল—(১) T-এরিয়েল (২) উল্টা L-এরিয়েল
(৩) নাউয়েন (Naun)-এ ব্যবহৃত ছাতা-এরিয়েল

(৩) উল্টা L-এরিয়েল :—১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মার্কোনিই সর্বপ্রথম এই এরিয়েল প্রবর্তন করেন। খুব উঁচুতে একটি অনুভূমিক তার খাটিয়ে তার

এক প্রান্ত থেকে সংযোজক তার নীচের দিকে খাড়া ভাবে নামিয়ে নেওয়া হয়। অনেক সময় একাধিক অনুভূমিক লম্বা তার পাশাপাশি সমান্তরাল করে খাটিয়ে এদের এক প্রান্ত থেকে সংযোজক তারগুলি একসঙ্গে যুক্ত ক'রে নীচের দিকে নামিয়ে আনা হয়। এরিয়েলটি ইংরেজি L-অক্ষরের উল্টা দেখায় বলে একে উল্টা L-এরিয়েল নাম দেওয়া হয়েছে।

এই এরিয়েলের বিকিরণী-শক্তি সব দিকে সমান নয়। প্রেরক-যন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহার করলে দেখা যায়, অনুভূমিক লম্বা তারের যে প্রান্তে সংযোজক তার যুক্ত করা হয়—লম্বা তারের বরাবর ঠিক সেই দিকেই বেতার-তরঙ্গ অন্যান্য দিকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সংক্রমিত হয়। আবার গ্রাহক-যন্ত্রে এই এরিয়েল লাগালে দেখা যায় যে অনুভূমিক তারের বরাবর ঠিক সেই একই দিক্ থেকে বেতার-তরঙ্গ এলে তা সবচেয়ে বেশী পরিমাণে গৃহীত হয়।

(৪) ছাতা-এরিয়েল :—একটি উঁচু ও খাড়া স্তম্ভের উপর থেকে ছাতার শিকের মত, স্তম্ভের চারদিকে সমান ভাবে কতকগুলি তার মাটি পর্যন্ত খাটানো হয়। প্রত্যেকটি তারের উপরের দিকে একটি অন্তরক (insulator) ও নীচের দিকে মাটির কিছু উপরে আর একটি অন্তরক বাঁধা থাকে। তারের উপরের প্রান্তগুলি একসঙ্গে যুক্ত করা হয়। নীচের প্রান্তগুলির মধ্যেও যোগ থাকে। উপরের যে-কোনও প্রান্ত থেকে সংযোজক তার-প্রেরক কিংবা গ্রাহক-যন্ত্রে লাগানো হয়।

উল্লিখিত এরিয়েলগুলি দীর্ঘ বা মধ্যম-তরঙ্গের জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হয়। হ্রস্ব-তরঙ্গের জন্য এরিয়েলের তার অনুভূমিক ভাবে বা খাড়া ভাবে মাটি থেকে বেশ উঁচুতে খাটানো হয়। এই এরিয়েলে দুটি সমান লম্বা তার এক সরল রেখায় থাকে। তার দুটির মধ্যে একটু ফাঁক রাখা হয় এবং তার দুটি মিলে এরিয়েলটি লম্বায় হয় অর্ধ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান। ফাঁকের স্থানে তার দুটির প্রান্ত থেকে জোড়া তার

প্রেরক কিংবা গ্রাহক-যন্ত্রে যুক্ত করবার ব্যবস্থা থাকে। হ্রস্ব-তরঙ্গের ট্রান্স্মিটার-প্রসঙ্গে পূর্বে এই এরিয়েলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
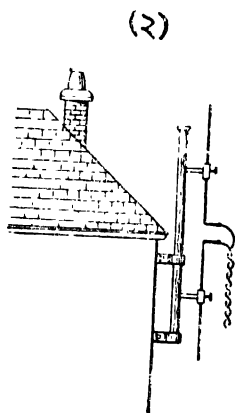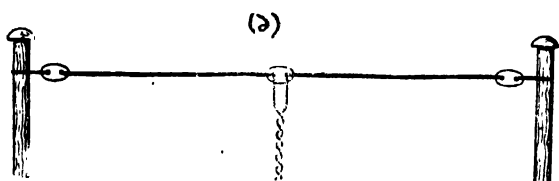
হ্রস্ব-তরঙ্গের এরিয়েল—(১) অনুভূমিক ব্যবস্থা, (২) উর্ধ্বাধ ব্যবস্থা। তারের দৈর্ঘ্য অর্ধ-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান

কোনও বিশেষ দিকে বেতার-বার্তা, কথা বা গান পাঠাতে হলে বেতার-তরঙ্গ সব দিকে পাঠিয়ে বৃথাই কেবল শক্তির অপব্যয় করা সঙ্গত নয়। যে বিশেষ দিকে বার্তা বা গান পাঠাবার অভিপ্রায় কেবল ঠিক সেই দিকেই যদি বেতার-তরঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করা যায় তবে খুব কম-শক্তির প্রেরক-যন্ত্র থেকেই বেশী দূর পর্যন্ত কথা বা গান পাঠানো সম্ভব হয়। হার্ৎস্ প্রথম যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করেছিলেন তার দৈর্ঘ্য ছিল

কয়েক ইঞ্চি মাত্র। মোটর গাড়ীর সামনের হেড-লাইটের আলো যেমন প্রতিফলকের সাহায্যে রশ্মির মত কেবল একই দিকে ফেলা যায়, ধাতু-নির্মিত উপযুক্ত প্রতিফলকের সাহায্যে হার্ৎস্‌ তাঁর হ্রস্ব তরঙ্গগুলি তেমনি ইচ্ছানুরূপ বিশেষ বিশেষ দিকে সংক্রমিত করেছিলেন। বেতারের আদি-পর্বে মার্কোনি যখন তাঁর স্পার্ক-ট্রান্‌স্মিটার থেকে বিলীয়মান হ্রস্ব-তরঙ্গ নিয়ে কাজ করছিলেন তখন তিনিও ধাতুনির্মিত প্রতিফলক ব্যবহার ক'রে ইচ্ছানুরূপ যে-কোনও দিকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সংক্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রতিফলক ছিল উপবৃত্তের আকারের।

সমান্তরাল আলোর রশ্মির ন্যায় কেবল এক দিকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-সংক্রমণকেই ইংরেজিতে beam transmission বলে। এই উদ্দেশ্যেই আজকাল অনেকগুলি খাড়া এরিয়েল অর্ধ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পর পর এক বা দুই সারিতে খাটানো হয়। এরই নাম এরিয়েলের সারি। এর মূল তত্ত্বটি এই :—দূরবর্তী কোনও স্থানে এরিয়েল-সারির প্রত্যেকটি এরিয়েল থেকেই বিদ্যুতের ঢেউ গিয়ে পৌঁছয়। ঐ স্থান থেকে প্রত্যেকটি এরিয়েলের দূরত্ব এক নয়। দূরত্বের তারতম্য যদি অর্ধ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা তার বিজোড় সংখ্যার গুণিতক হয় তবে ঐ স্থানে পর পর এরিয়েলগুলি থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের চাপ (crest), ও খোল (trough) পর্যায়ক্রমে হয়। চাপে ও খোলে কাটাকাটি হয়ে তখন ঐ স্থানে তরঙ্গের কোনও সাড়াই থাকে না। কিন্তু দূরত্বের তারতম্য যদি কোনও পূর্ণসংখ্যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান হয় তবে ঐ স্থানে সব তরঙ্গের চাপ অথবা খোলের একত্র সমাবেশ হয়। ফলে ঐ স্থানে তরঙ্গের জোর হয় অনেক গুণ বেশী। এই ভাবে বিভিন্ন তরঙ্গের একত্র সমাবেশে কোনও বিশেষ দিকে তরঙ্গের জোর সবচেয়ে বেশী করাই এরিয়েল-সারির কাজ। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্রাউন (S. G. Brown) ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ব্লণ্ডেল (Blondel) অর্ধ-তরঙ্গের ব্যবধানে দুটি মাত্র খাড়া এরিয়েল খাটিয়ে বিশেষ দিকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ

পাঠাবার প্রথম চেষ্টা করেন। ১৯১৩ সনে ইতালির বেলিনি (Bellini)-র চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে মার্কোনিও এই গবেষণায় নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সনে কর্ণওয়ালের পোল্‌ঢু (Poldhu) স্টেশনে তিনি যে এরিয়েলের সারি ব্যবহার করেছিলেন তা থেকে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। এই সাফল্যের পরই মার্কোনির পরামর্শে বৃটিশ গবর্মেণ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির হ্রস্ব-তরঙ্গের ট্রান্‌স্মিটারের সঙ্গে এরিয়েলের সারি ব্যবহার করা সাব্যস্ত করেন। কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে বেতার-বার্তা প্রেরণের জন্য এরিয়েল-সারি সহ ট্রান্‌স্মিটার নির্মাণের ভার মার্কোনি কোম্পানিকে দেওয়া হয়। ১৯২৭ সনে এই কাজ সম্পূর্ণ হয় ও সেই বছর থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য বীম-ট্রান্‌স্মিশন সুরু হয়।

বীম-স্টেশনগুলির এরিয়েল-সারি কি রকম, ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়ার জন্য গ্রিমস্‌বি (Grimsby)-র নিকট টেট্‌নি (Tetney)-তে যে এরিয়েলের সারি ব্যবহার করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে তা কতকটা বোঝা যাবে। ২৬০ ফুট উঁচু ও খাড়া তিনটি মাস্ট (mast) ৬৫০ ফুট পর পর এক সরল রেখায় লাগানো; আর এই সরল রেখার আড়াআড়িভাবে প্রত্যেক মাস্টের মাথায় ৯০ ফুট মাপের ইস্পাতের এক একটি বাহু। প্রত্যেক মাস্টের বাহুর দুই প্রান্ত দিয়ে দুই লম্বা অনুভূমিক তার সমান্তর ক'রে খাটানো। এই তার দুইটির প্রত্যেকটি থেকে ৩২টি তার অর্দ্ধ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পর পর খাড়াভাবে নীচের দিকে নামানো। খাড়া তারগুলির দৈর্ঘ্য দুই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কিছু বেশী। এই দুই সমান্তরাল এরিয়েল-সারির মাঝখানে আরও একটি সারি। এই সারিতে ৬৪টি তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এক-চতুর্থাংশ ব্যবধানে পর পর খাড়াভাবে বসানো। এই সারিটি প্রতিফলকের কাজ করে। ৩২টি তারের কোনও একটি সারিতে যখন প্রত্যেকটি খাড়া তারে বিদ্যুতের স্পন্দন চলতে থাকে তখন দেখা যায় এরিয়েল-

সারির আড়াআড়ি দিকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সামনে খুব বেশি ও পিছনে অতি অল্প পরিমাণে সংক্রমিত হয়। ৬৪টি তারের প্রতিফলক-সারিটি এই পশ্চাতের তরঙ্গটিকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়।

ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে আসতে হলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে দুই পথে যাওয়া যায়। কাছের পথটি মধ্য-ইউরোপ ও ইরানের পথ। আর ঠিক বিপরীত দিকের পথটি আটলাণ্টিক মহাসাগর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে এক দীর্ঘ পথ। দিনে ও রাত্রে বেতার-তরঙ্গ সমানভাবে সঞ্চারিত হয় না, সেজন্য দিন ও রাত্রি বুঝে কখনও কাছের পথে, কখনও বা দূরের পথে বেতার-তরঙ্গ পাঠানো হয়। এই দুই পথের জন্যই ৩২টি তারের দুইটি সারি। কাছের বা দূরের যে-কোনও পথে ঢেউ পাঠাতে হলে এই দুই সারির একটিতে ২৫ কিলো-ওয়াট শক্তির ট্রান্‌স্মিটার থেকে বিদ্যুৎ-স্পন্দন চালিত করা হয়। কাছের পথ ও তার বিপরীত দিকের দীর্ঘ পথের জন্য সাধারণত দুরকম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়। টেট্‌নিতে ভারতবর্ষের জন্য যে এরিয়েল-সারি ব্যবহার করা হয় তা থেকে ১৬ মিটার ও ৩২ মিটারের বেতার-তরঙ্গ পাঠানো হয়। অস্ট্রেলিয়ার জন্য নির্মিত এরিয়েল-সারি থেকে দুই পথেই ২৬ মিটারের বেতার-তরঙ্গ প্রেরিত হয়। এরিয়েল-সারির তারগুলিতে অর্ধ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পর পর উপযুক্ত মাপের তারের কুণ্ডলী জোড়া দেওয়া থাকে। ফ্রাঙ্কলিনই প্রথম এই ভাবে কুণ্ডলীর ব্যবহার ক'রে এরিয়েল-সারির উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। মার্কোনি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত এই বীম-স্টেশনগুলির এরিয়েল-সারিকে সেজন্য ফ্রাঙ্কলিন-মার্কোনি এরিয়েল-সারি বলা হয়।

এরিয়েলের সারি নানা রকমের হয়। বেতার টেলিফোনির জন্য রাগবিতে ও অন্যত্র বৃটিশ পোস্ট অফিস পরিচালিত হ্রস্ব-তরঙ্গের ট্রান্‌স্মিটারে টি. ওয়াম্‌স্‌লি (T. Walmsley) কর্তৃক প্রবর্তিত এক রকমের

এরিয়েলের সারি ব্যবহার করা হয়। প্রবর্তকের নামের আদ্যক্ষর অনুসারে এই এরিয়েল-সারির নাম T. W.-সারি। জার্মেনীর প্রসিদ্ধ নাউয়েন (Nauen)-স্টেশনে হ্রস্বতরঙ্গের ট্রান্স্মিটারে যে এরিয়েল-সারি ব্যবহার করা হয় তা এক বিশেষ রকমের সারি। জার্মেনীতে টেলিফুংকেন কোম্পানির 'টানেনবাউম' ('Tannenbaum') ও হল্যাণ্ডে 'কুমান' ('Kooman') নামে যে দুটি এরিয়েলের সারি দেখা যায় সে দুটি একই ধরণের। শিরে (Chireix) ও মেজ্‌নি (Mesney) কর্তৃক প্রবর্তিত এক বিশেষ রকমের এরিয়েল-সারি ফরাসি দেশে প্রচলিত দেখা যায়। আমেরিকার প্রসিদ্ধ আর-সি-এ (R. C. A.) পরিচালিত বীম-স্টেশনগুলিতে তাদের নিজস্ব ধরণের এরিয়েল-সারি ব্যবহার করা হয়।

ব্রড্‌কাসটিং-এর জন্য যে-সব হ্রস্ব-তরঙ্গের ট্রান্স্মিটার পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই সব ট্রান্স্মিটারে এরিয়েলের সারি ব্যবহার করা হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ডাভেনট্রিতে যে বি-বি-সি বেতার-কেন্দ্র আছে সেখানকার হ্রস্ব-তরঙ্গের ট্রান্স্মিটারের জন্য সবসুদ্ধ ২৩টি এরিয়েল-সারি খাটানো আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ছয় ভাগে ভাগ ক'রে প্রত্যেক ভাগের জন্য এই সব এরিয়েল-সারির কোনও-না-কোনওটি ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর হ্রস্ব-তরঙ্গের ট্রান্স্মিটারে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের জন্য ছয়টি বিভিন্ন দিকে বেতার-তরঙ্গ পাঠাবার উদ্দেশ্যে এরিয়েলের সারি খাটানো হয়েছে।

কোনও বিশেষ দিকের রেডিও-স্টেশন থেকে সংকেত, কথা বা গান শুনতে হলে গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে দিক্-ধর্মী (directive) এরিয়েল ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এখানে কয়েক রকমের দিক্-ধর্মী এরিয়েলের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) বেভারেজ (Beverage) এরিয়েল :—দীর্ঘ তরঙ্গের জন্য গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে এই এরিয়েল খুব কার্যকরী। মাটি থেকে ১০-২০ফুট

উঁচুতে অনুভূমিক এক তার, দূরের যে ট্রান্‌স্মিটারের তরঙ্গ আমরা ধরতে চাই সেই দিকে বরাবর খাটানো হয়। তারের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে অর্ধ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান হওয়া দরকার। ট্রান্‌স্মিটারের দিকের তারের প্রান্তটি যথাযথ মাপের রোধের ভিতর দিয়ে মাটির সহিত ও অন্য প্রান্তটি গ্রাহক-যন্ত্রের সহিত যুক্ত করা হয়। অনেক সময় কয়েকটি বেভারেজ এরিয়েল পাশাপাশি সমান্তরাল ক'রে খাটানো থাকে। ট্রান্‌স্মিটারের সঙ্গে দীর্ঘতরঙ্গের বেভারেজ এরিয়েল ভাল কাজ দেয় না। হ্রস্ব-তরঙ্গের জন্য বেভারেজ এরিয়েল অন্যরকমের—প্রেরক ও গ্রাহক উভয় যন্ত্রেই তা ব্যবহার করা যায়।

(২) হেলানো তারের (Tilted wire) এরিয়েল :—বেতার-তরঙ্গ যে দিক্ থেকে আসে সেই দিকে যদি কোনও লম্বা তার তির্যক্ ভাবে বসানো যায়, তবে ঐ হেলানো তার গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েল হিসাবে খুব ভাল কাজ করে। কতখানি দৈর্ঘ্যের তার কতখানি হেলিয়ে খাটালে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায় তা হিসাব করা সম্ভব। নির্দিষ্ট কোণ ক'রে খাটালে তারের দৈর্ঘ্যও হিসাবমত নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। যথাযথ মাপের দুটি তার যদি বিপরীত দিক থেকে সমানভাবে হেলিয়ে খাটানো যায় যাতে তার দুটি উল্টা V-অক্ষরের মত মনে হয়, তবে এই উল্টা V-এরিয়েল গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহার করলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। তার দুটির মধ্যে একটি তারের নীচের প্রান্ত গ্রাহক-যন্ত্রে লাগানো হয় ও অন্য তারটির নীচের প্রান্ত যথাযথ মাপের রোধের ভিতর দিয়ে মাটির সহিত যুক্ত করা হয়।

(৩) রম্বস (rhombus) বা হীরক এরিয়েল :—বেশ উঁচুতে অনুভূমিক ক্ষেত্রে দু'জোড়া তার একটি রম্বসের আকারে খাটানো হয়। রম্বসের লম্বা দিকের এক কোণ থেকে সংযোজক তার গ্রাহক-যন্ত্রে লাগানো হয় ;—এর ঠিক বিপরীত কোণ যথাযথ মানের

একটি রোধের ভিতর দিয়ে মাটির সহিত যুক্ত করা হয়। যে ট্রান্স্মিটিং স্টেশন আমরা ধরতে চাই রম্বস-এরিয়েলটি এমনভাবে খাটানো হয় যাতে এর দুই বিপরীত কোণের দীর্ঘতর কর্ণ (diagonal) ঐ ট্রান্স্মিটিং স্টেশনের দিকে থাকে। রম্বস-এরিয়েলকে অনেক সময় হীরক-এরিয়েলও বলা হয়। বিভিন্ন রেডিও স্টেশন ধরতে হলে হীরক-এরিয়েল বিভিন্ন দিকে খাটাতে হয়। তাদের দৈর্ঘ্য ও কোণ হিসাব ক'রে ঠিক ক'রে নেওয়া দরকার।

প্রত্যেক বেতার-প্রেরক-কেন্দ্রেই আজকাল রিলে (relay) বা ধ্বনি-সম্প্রসারণের ব্যবস্থা আছে। যে স্টেশন রিলে করার উদ্দেশ্য, প্রথমত ভাল গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে সেই স্টেশনের ধ্বনি পুনরুৎপাদন করা হয়। যে নীচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দনে গ্রাহক-যন্ত্রের লাউড স্পীকারে ধ্বনির পুনরুৎপাদন হয় সেই নীচুহারের স্পন্দনই প্রেরক-যন্ত্রের উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাবেই যে-কোনও প্রেরক কেন্দ্রের বাহক তরঙ্গ তার নিজস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে অন্য কোনও প্রেরক-কেন্দ্রের কথা বা গান বয়ে আনতে পারে। যে স্টেশন রিলে করা অভিপ্রেত সেই স্টেশন ধরবার জন্য খুব ভাল গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে সাধারণত হীরক-এরিয়েল ব্যবহার করা হয়।

(৪) ফ্রেম (frame)-এরিয়েল :—সাধারণত কাঠের একটি ফ্রেমে ত্রিভুজ, বৃত্ত বা চতুর্ভুজের আকারে অনেক বার ক'রে তার জাড়ানো হয়। ফ্রেমে-আঁটা এই তারের কুণ্ডলীকেই ফ্রেম-এরিয়েল বলে। ফ্রেম-এরিয়েলটি খাড়াভাবে রাখা হয় এবং ফ্রেমটি যাতে ইচ্ছামত যে-কোনও দিকে ঘোরানো যায় তার ব্যবস্থা থাকে। কোনও বেতার-ট্রান্স্মিটিং স্টেশনের দিকে যদি ফ্রেম-এরিয়েলটি ঘুরিয়ে রাখা হয়, তবে বেতার-তরঙ্গ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে গৃহীত হয়; আর আড়াআড়ি ভাবে যদি ফ্রেম-এরিয়েলটি রাখা হয় তবে কোনও তরঙ্গই গৃহীত হতে

পারে না। গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে ফ্রেম-এরিয়েল ব্যবহার করতে হলে যে স্টেশন শুনতে চাই ঠিক সেই দিকে ফ্রেমটি ঘুরিয়ে এরিয়েলের তারকে আগন্তুক বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে সুর-সঙ্গত ক'রে নিতে হয়। সুর-সঙ্গত করতে হলে উপযুক্ত মাপের একটি পরিবর্তনশীল কন্‌ডেন্সার ফ্রেম-এরিয়েলের সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার।

ফ্রেম-এরিয়েল ঘুরিয়ে যে দিকে গ্রাহক-যন্ত্রে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায় সেই দিকেই বেতার-ট্রান্‌স্মিটিং স্টেশনটি অবস্থিত, তা বেশ সহজেই বোঝা যায়; কিন্তু স্টেশনটি ঐ দিকে সামনে কি পিছনে, তা জানা সম্ভব নয়। সঠিক ভাবে রেডিও স্টেশনের অবস্থান জানতে হলে ফ্রেম-এরিয়েলের সঙ্গে একটি খাড়া এরিয়েল বা T-এরিয়েল যুক্ত ক'রে দিক্‌ নির্দেশ যন্ত্র তৈরি করা হয়। ইতালির বেলিনি (Bellini) ও টোসি (Tosi) প্রবর্তিত দিক্‌-নির্দেশ যন্ত্র সমুদ্রগামী অনেক জাহাজেই দেখা যায়। এই যন্ত্রে দুটি ফ্রেম-এরিয়েল আড়াআড়ি ভাবে বসানো থাকে এবং গ্রাহক-যন্ত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ এক ব্যবস্থায় একটি বাক্সের ভিতর একটি হাতল বা knob ঘোরানো হয়। এই হাতলের সহিত সংলগ্ন কাঁটা দেখেই রেডিও স্টেশনের অবস্থান-নির্দেশক কোণটি স্কেল (scale)-এ পড়ে নেওয়া যায়। এই বিশেষ ব্যবস্থাটির নাম—রেডিও গোনিওমিটার (goniometer)। রাত্রে বেলিনি-টোসি দিক্‌-নির্দেশ যন্ত্র বা ঐ জাতীয় ব্যবস্থা ভাল কাজ দেয় না, সেজন্য দিক্‌-নির্দেশের জন্য অ্যাডকক (Adcock) এক নূতন ব্যবস্থা করেন। অ্যাডককের ব্যবস্থায় রাত্রিবেলাতেও নির্ভুল ভাবে দিক-নির্দেশ সম্ভব।

বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রের কথা

(কৃস্টাল-সেট ও সাধারণ ভাল্‌ভ-সেট)

বেতার-তরঙ্গ যখন কোনও গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলের তারে এসে পড়ে তখন ঐ তারে বিদ্যুতের স্পন্দন সঞ্চারিত হয়। সাধারণত এই স্পন্দন অতি ক্ষীণ হয়। কিন্তু এরিয়েলের সঙ্গে উপযুক্ত মাপের কন্‌ডেন্সার ও কয়েল জুড়ে আগন্তুক বেতার-তরঙ্গের সহিত এরিয়েলটিকে সুর-সঙ্গত করলে ক্ষীণ স্পন্দন বেশ জোরালো করা যায় ; কিন্তু জোরালো হলেই কি হেড-ফোন বা লাউড-স্পীকারে বেতার-সংকেত কথা বা গান শোনা সম্ভব ? বেতার-তরঙ্গের বিদ্যুৎ-স্পন্দন এত দ্রুত যে হেড-ফোন বা লাউড-স্পীকারের পর্দার পক্ষে এত দ্রুত তালে কাঁপা এক অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই বেতার-গ্রাহকযন্ত্রের হেড ফোন বা লাউড-স্পীকারে কোনও সাড়াই পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে সংকেত, কথা বা গান শুনতে হলে বিশেষ উপায় অবলম্বন করা দরকার।

মনে করা যাক্, কোনও একটি লোককে একবার পিছন দিক্ থেকে আর একবার সামনের দিক্ থেকে— এই ভাবে ক্রমান্বয়ে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে। ফলে লোকটি দোলকের মত দুলতে সুরু করে। কিন্তু এই এদিক্-ওদিক্ ধাক্কা খাওয়া যদি সেকেণ্ডে লক্ষ বার কিংবা তারও বেশী হয় তবে তার দশাটা কি হয় ? এত ঘন ঘন ধাক্কা যদি সম্ভবও হয়, লোকটির মনে হবে যেন কিছুই হয় নি, কারণ এত দ্রুত তালে দুলতে পারে মানুষের দেহ মোটেই সেরূপ নমনীয় নয়। এ অবস্থায় যদি একদিক্‌কার ধাক্কা বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় তবে কিন্তু লোকটির সমূহ বিপদ ! শুধু যে দিকে বারবার ধাক্কা চলতে থাকে সেই দিকেই সে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে— তাতে আর সন্দেহ কি ? এই তুলনামূলক দৃষ্টান্ত থেকে বলা

যেতে পারে যে বেতার-তরঙ্গের মত উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দনে হেড-ফোন বা লাউড স্পীকারের পর্দায় সাড়া জাগাতে হলে বিদ্যুৎ-স্পন্দনের একদিক্‌কার গতি একেবারে বন্ধ করা দরকার। এই ভাবে বিদ্যুৎ-স্পন্দনের পরিবর্তী প্রবাহকে সমপ্রবাহে পরিণত করাকেই একমুখীকরণ বা সমসাধন (rectification) বলা হয়। এই সমসাধনই বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রের প্রধান কথা।

প্রথমত কোনও স্পার্ক-স্টেশনের বিলীয়মান তরঙ্গ-দলের কথা ধরা যাক্। এই তরঙ্গের দল যখন গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে এসে পড়ে তখন এরিয়েলের তারে অনুরূপ বিদ্যুৎ-স্পন্দন হতে থাকে। এই বিদ্যুৎ-স্পন্দনের সমসাধনে পর পর কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী সমপ্রবাহ পাওয়া যায়। এই পৌনঃপুনিক সমপ্রবাহই হেড-ফোনের পর্দাকে কাঁপিয়ে তোলে। বিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে এই সমপ্রবাহকে যদি বাড়ানো যায় তবে লাউড-স্পীকারের পর্দাও সাড়া দেয় এবং বেতার-সংকেত জোরে শোনা যায়। আবার কোনও বেতার-প্রেরক-কেন্দ্র থেকে যখন মিশ্র বা বিকৃত তরঙ্গ এসে গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে পড়ে তখন এরিয়েলের তারে সেই একই রকমের মিশ্র স্পন্দন সুরু হয়। সমসাধনের ফলে এই মিশ্র স্পন্দনের কেবল একদিক্‌কার বিদ্যুৎ-প্রবাহই পাওয়া যায়। এই সমপ্রবাহের পরিবর্তনই হেড-ফোনের পর্দাকে কাঁপিয়ে তোলে। এই নীচুহারের স্পন্দনকে বিবর্ধিত করলে লাউড স্পীকারেও কথা বা গান শোনা যায়।

সমসাধন নানা প্রকারে সম্ভব। গ্যালেনা (galena), কার্বরাণ্ডাম (carborundum), সিলিকন (silicon), জিনকাইট (zincite) প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলি ক্রস্টালের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এদের গুণ এই যে কোনও ধাতুর পিন এদের গায়ে লাগিয়ে এদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-স্পন্দন বা পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করলে তা সম-প্রবাহে

পরিণত হয়। জার্মেন বিজ্ঞানী কার্ল ফ্রেডারিক ব্রাউন (Karl Frederick Braun) ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই আবিষ্কার করেন। কিন্তু এর তত্ত্ব এখনও বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণভাবে জানেন না। এই নিয়ে অবশ্য অনেক গবেষণা হয়েছে।

ক্রুস্টাল-সেটের একটি সার্কিট প্রদর্শিত হ'ল। কয়েলের এক প্রান্ত এরিয়েলের সহিত ও অন্য প্রান্ত মাটির সহিত সাধারণত সংযুক্ত থাকে।
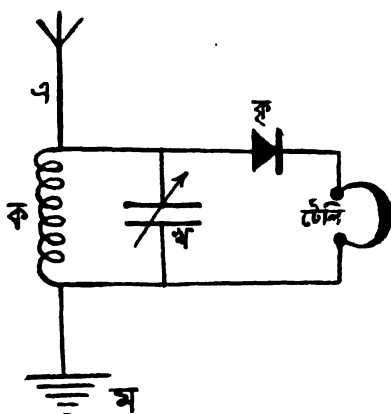
ক্রুস্টাল-সার্কিট : এ—এরিয়েল, ক—কয়েল, খ—পরিবর্তনশীল কনডেন্সার, ক্রু—ক্রুস্টাল ও পিন, ম—মাটি (earth), টেলি—টেলিফোন

উপযুক্ত মাপের কয়েল ও কনডেন্সারের সাহায্যে এরিয়েলটিকে সুর-সঙ্গত বা টিউন (tune) করা হয়। এই সুর-সঙ্গতির ফলে এরিয়েলের সার্কিটে বিদ্যুৎ-স্পন্দন অনেক জোরালো হয়। ক্রুস্টালের সার্কিটে যে হেড-ফোন লাগানো থাকে, সমসাধনের ফলে এই হেড-ফোনে কাছের স্টেশনের বেতার-সংকেত, কথা বা গান সহজেই শোনা যায়।

ভাল্‌ভ দিয়ে যে সমসাধন করা হয় তাতে প্রধানত দুরকম ব্যবস্থা প্রচলিত। প্রথমেই উপযুক্ত মাপের কয়েল ও কনডেন্সারের সাহায্যে

এরিয়েলটিকে টিউন করা হয়। টিউনিং-এর ফলে জোরাল বিদ্যুৎ-স্পন্দন ভাল্‌ভের গ্রিড ও ফিলামেণ্টে চালনা করা হয়। প্রথম ব্যবস্থায় ভাল্‌ভের প্লেট-সার্কিটে বিদ্যুৎ-স্পন্দন সমপ্রবাহে পরিণত হয়। একেই প্লেট-সমসাধন (plate rectification) বলে। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় সম-সাধন হয় গ্রিড-সার্কিটে এবং গ্রিড-সার্কিটের সমপ্রবাহের ফলে প্লেট-

গ্রিড-সমসাধক ভাল্‌ভ-সার্কিট (grid-rectifying valve-circuit) : এ—এরিয়েল, ক—কয়েল, খ—পরিবর্ত্তনশীল কন্‌ডেন্সার, গ—কন্‌ডেন্সার, ঘ—গ্রিড লীক (grid-leak), ম—মাটি (earth)
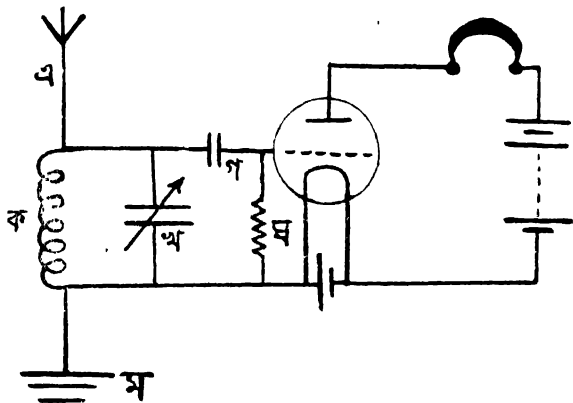
সার্কিটেও অনুরূপ প্রবাহ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির নাম গ্রিড-সমসাধন (grid rectification)। দুই ব্যবস্থাতেই প্লেট-সার্কিটে অবস্থিত হেড-ফোনে সংকেত, কথা বা গান শোনা যায়। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় গ্রিডের ঠিক গোড়াতেই একটি উপযুক্ত মাপের কন্‌ডেন্সার বসানো হয় ও একটি বেশী মানের রোধের ভিতর দিয়ে গ্রিডের সঙ্গে ফিলামেণ্টের যোগ থাকে। এই রোধটি উপযুক্ত মানের হওয়া দরকার। রোধটি না থাকলে ভাল্‌ভের গ্রিডে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঋণ-বিদ্যুৎ জমে গিয়ে

ভাল্‌ভটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। রোধটি যেন ছিদ্রপথ—গ্রিডে সঞ্চিত বিদ্যুৎ এর ভিতর দিয়ে সহজেই বহির্গত হয়ে যায়! এই রোধেরই ইংরেজি নাম গ্রিড-লীক্ (grid leak)।

সমসাধনের জন্য যখন ভাল্‌ভ ব্যবহার করা হয় তখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া-মূলক বিবর্ধনের (amplification by reaction) ব্যবস্থা থাকে। সাধারণত প্লেট-সার্কিটে একটি কয়েল গ্রিড-সার্কিটের কয়েলের কাছাকাছি এমনভাবে বসানো হয় যাতে দুই সার্কিটের ভিতর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চল্‌তে থাকে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎ-স্পন্দনের বিবর্ধন হয়। প্লেট-সার্কিটের কয়েলটিকে গ্রিড-সার্কিটের কয়েলের কাছে ও দূরে আন্‌বার বন্দোবস্ত থাকে। খুব বেশী কাছে আন্‌লে নূতন বিদ্যুৎ-স্পন্দন সুরু হয়ে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। যাতে এরকম নূতন স্বতঃ-স্পন্দন সুরু না হয় অথচ দুটি কয়েল বেশ কাছাকাছি থাকে—এরকম ব্যবস্থায় স্পন্দন বেশ জোরাল করা যায়। কখনও কখনও কয়েল দুটি নির্দিষ্ট স্থানেই বসানো থাকে—প্লেট-সার্কিটের কয়েল ও হেড-ফোনের মাঝখানে একটি পরিবর্তনশীল কন্‌ডেন্সার বসিয়ে তারই সাহায্যে প্রতিক্রিয়ামূলক বিবর্ধনের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আমেরিকার ল্যাংমুর (Langmuir) ও ডি ফরেস্ট (de Forest), জার্মেনীর মাইস্‌নার (Meissner) এবং ইংলণ্ডের ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বস্তুত বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রে বিবর্ধন একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ-স্পন্দন সমপ্রবাহে পরিণত হবার পর আমরা যে সংকেত, কথা বা গান অনুযায়ী কম-বেশী সমপ্রবাহ পাই—এ হ'ল নীচুহারের পরিবর্তন। এই নীচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন এক বা একাধিক ভাল্‌ভের সাহায্যে বিবর্ধিত করা হয়। একেই বলে নিম্নহার বিবর্ধন (low frequency amplification)। সাধারণত ট্রান্‌সফর্মারের মধ্যস্থতায় উপযোগী

ভাল্‌ভের সাহায্যে এই বিবর্ধনের ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নহার বিবর্ধনের অন্যরকম ব্যবস্থাও আছে।

এরিয়েলের তারে বেতার-তরঙ্গ লেগে যে উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন হয় তারই বৃদ্ধিসাধনের নাম উচ্চহার বিবর্ধন (high frequency amplification)। ত্রিপদী ভালভের সাহায্যে এই বিবর্ধনে অসুবিধা আছে। বিদ্যুৎ-স্পন্দনের হার উঁচু হলে ত্রিপদী ভাল্‌ভের গ্রিড ও প্লেটের ভিতর দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তার ফলে বিবর্ধক ভাল্‌ভে নূতন স্পন্দন হবার সম্ভাবনা থাকে। এর প্রতিবিধানের জন্য ট্রান্‌স্মিটারে যেমন প্রতিষেধক কন্‌ডেন্সার ব্যবহার করা হয়, বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রেও তেমনি ত্রিপদী ভাল্‌ভের সার্কিটে অনুরূপ ব্যবস্থা সম্ভব। ১৯২৩ সনে ইংলণ্ডের রাইস (C. W. Rice) ও আমেরিকার হেজল্‌টিন (L. A. Hazeltine) এ বিষয়ে যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন তা খুবই কার্য্যকরী হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক চতুষ্পদী স্ক্রীন-গ্রিড (screengrid) ভাল্‌ভের প্রচলনে প্রতিষেধক কন্‌ডেন্সারের আর দরকার হয় না। স্ক্রীন-গ্রিড ভাল্‌ভে প্লেট ও গ্রিডের মধ্যে একটি দ্বিতীয় গ্রিড বসানো থাকে। এই দ্বিতীয় গ্রিডে প্লেট অপেক্ষা কিছু কম ভোল্‌টেজ দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় প্লেট-সার্কিট ও গ্রিড-সার্কিটের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া থাকে না। দ্বিতীয় গ্রিডটি যেন এই দুই সার্কিটের মধ্যে ব্যবধান বা স্ক্রীন (screen)-এর কাজ করে। এইজন্যই এর নাম স্ক্রীন-গ্রিড এবং এই অতিরিক্ত গ্রিড-বিশিষ্ট ভাল্‌ভকে স্ক্রীন-গ্রিড ভাল্‌ভ বলে। এর বিবর্ধনী শক্তি সাধারণ ত্রিপদী ভাল্‌ভের চেয়ে অনেক বেশী।

সাধারণ ভাল্‌ভ-সেটে উচ্চহার বিবর্ধন, সমসাধন ও নিম্নহার বিবর্ধন—পর পর এই তিনটি ব্যবস্থাই সাধারণত দেখা যায়। উচ্চহার বিবর্ধনের জন্য এক বা একাধিক স্ক্রীন-গ্রিড ভাল্‌ভ আর নিম্নহার বিবর্ধনের শেষ ধাপে অনেক সময় বেশী শক্তির একটি পঞ্চপদী (pentode) ভাল্‌ভ

ব্যবহার করা হয়। স্ক্রীন-গ্রিড ভাল্‌ভের স্ক্রীন-গ্রিড ও প্লেটের মাঝখানে তৃতীয় একটি গ্রিড বসিয়ে পঞ্চপদী ভাল্‌ভ তৈরি করা হয়। তৃতীয় গ্রিডটির সঙ্গে ভাল্‌ভের ফিলামেণ্ট বা ক্যাথোডের যোগ থাকে। সব শেষে থাকে লাউড-স্পীকার।

সেটের ভাল্‌ভগুলির প্লেট ও স্ক্রীন-গ্রিডের জন্য যে ভোল্‌টেজ লাগে তার জন্য উপযুক্ত বড় ব্যাটারি ও ফিলামেণ্টের জন্য ছোট ব্যাটারির প্রয়োজন হয়। ব্যাটারির সাহায্যে যে-সব সেট চালানো হয় তাদের ব্যাটারি-সেট বলে। যে-সব বাড়িতে বিজলী বাতি আছে সেখানে বিজলী বাতির লাইন থেকে ভোল্‌টেজ নিয়ে যাতে রেডিও-সেট চালানো যায় সে রকম সেটও তৈরি করা যায়। একেই মেইন্‌স-সেট (Mains Set) বলে। লাইনে উপযুক্ত মানের রোধ বসিয়ে লাইনের ভোল্‌টেজ কমিয়ে নেওয়া সম্ভব। যথাযথ মানের রোধের সাহায্যে ভাল্‌ভের যেখানে যা ভোল্‌টেজ দরকার তা প্রয়োগ করা হয়। ফিলামেণ্টের জন্য অপেক্ষাকৃত কম ভোল্‌ট দরকার হয়। লাইনে সেজন্য বেশী মানের রোধ বসিয়ে লাইনের ভোল্‌টেজ দরকার মত কমানো যায়। অনেক সেটে একটি বিশেষ ভাল্‌ভ এই রোধের কাজ করে—এরই নাম ব্যারেটার (Barretter)।

মেইন্‌স-সেট দুরকম হয়—D.C.-সেট্‌ ও A.C.-সেট্‌। যে সব জায়গায় সমপ্রবাহ বা D.C., সেখানে D.C.-সেট; আর যেখানে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা A.C., সেখানে A.C.-সেট ব্যবহার করা হয়। A.C.-সেটে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহকে সমপ্রবাহে পরিণত ক'রে নেবার জন্য বিশেষ ভাল্‌ভের ব্যবস্থা থাকে। যেখানে সমপ্রবাহের সরবরাহ সেখানে A.C.-সেট ব্যবহার করতে হলে ভাইব্রেটার (Vibrator) নামে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে D.C. কে A.C.-তে পরিণত করা প্রয়োজন। A.C. ও D.C. এই দুই ব্যবস্থাতেই যাতে

রেডিও-সেট ব্যবহার করা যায় অনেক সেটে তার বন্দোবস্ত থাকে—এদের A.C./D.C.-সেট বলে।

বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে যে লাউড-স্পীকার ব্যবহার হয় তা প্রধানত দু'রকমের। এক রকম লাউড-স্পীকার হেড-ফোনেরই বর্ধিত সংস্করণ। হেড-ফোনে দুই কানের জন্য দুটি একই রকমের ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেকটিতেই একটি স্থায়ী চুম্বকের এক প্রান্তে কাঁচা (soft) লোহার উপর কয়েল জড়ানো থাকে। কয়েলের ঠিক সামনেই থাকে একটি পাতলা লোহার পাত বা পর্দা। চুম্বকের আকর্ষণে এই পর্দাটি কয়েলের দিকেই বেঁকে থাকে। বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রের শেষ ভাল্‌ভ থেকে নীচু-

হেড-ফোন : (১) গ্রেহাম বেল প্রবর্তিত টেলিফোন রিসিভার, M—স্থায়ী চুম্বক, C—কয়েল। (২) আধুনিক হেড-ফোন। (৩) আধুনিক হেড-ফোনের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা
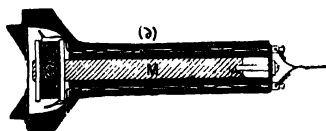
হারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন কয়েলটির ভিতর দিয়ে চালনা করা হয়। কয়েলের এই কম-বেশী বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে কয়েলটি চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় ও তার

সামনের লোহার পর্দাটিকে কম বা বেশী আকর্ষণ করতে থাকে। স্থায়ী চুম্বকের আকর্ষণের উপর এই কম-বেশী আকর্ষণেই পর্দাটি কাঁপে ও সেই সঙ্গে কথা বা গান শোনা যায়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার গ্রেহাম বেল (Graham Bell) প্রথম যে টেলিফোন নির্মাণ করেন তার একখানি চিত্র ও আধুনিক হেড-ফোনের একখানি ছবি এই সঙ্গে প্রদর্শিত হ'ল। আধুনিক হেড-ফোনে স্থায়ী চুম্বকটির অর্ধ-বৃত্তাকার আকৃতি লক্ষ্য করবার বিষয়। এর দুই মেরু থেকে দুটি কাঁচা লোহার দণ্ডের উপর দুটি কয়েল জড়ানো। কয়েল দুটির সামনেই লোহার পর্দা। এই ধরণের তৈরি লাউড-স্পীকারকে উচ্চশব্দকারী হেড-ফোন বলাই সমীচীন। পূর্বে লাউড-স্পীকারে হর্ন (horn) বা চোঙ্ লাগানো হ'ত। কিন্তু আজকাল
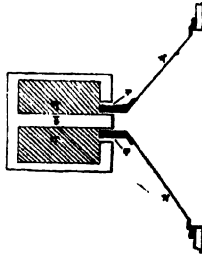
চলমান কয়েল-লাউড-স্পীকার (moving coil loudspeaker)—(ক) কয়েল, (খ) কাগজের শঙ্কু, (গ) তড়িৎ-চুম্বকের ফিল্ড (field) কয়েল, (চ) চুম্বকত্ব-প্রাপ্ত লৌহ-দণ্ড

লাউড-স্পীকারের কম্পমান লোহার পর্দায় বিশেষ কাগজ দিয়ে তৈরি শঙ্কু (cone)-র সূচ্যগ্রভাগটি সুকৌশলে সংলগ্ন করা থাকে। পর্দাটির সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কুটিও যখন কাঁপতে থাকে তখন বিবর্ধিত ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার লাউড-স্পীকারকে চলমান কয়েল-লাউড-স্পীকার বলে। এর নির্মাণ-রীতি চলমান কয়েল-মাইক্রোফোনের মত। স্থায়ী একটি চুম্বক অথবা বিদ্যুৎ-চুম্বকের মেরুদুটির মাঝখানে ছোট একটি কয়েল

আল্‌গা ভাবে বসানো থাকে। চুম্বকশক্তির ক্ষেত্রে অবস্থিত কয়েলটিতে যখন নীচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন চলতে থাকে তখন তড়িৎ-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে কয়েলটি এদিক-ওদিক নড়তে থাকে এবং কয়েল-সংলগ্ন কাগজের শঙ্কুও এই সঙ্গে কাঁপতে সুরু করে। এই ভাবেই লাউড-স্পীকারে দূরের রেডিও স্টেশনের কথা বা গান পুনরুৎপাদিত হয়। সাধারণত চলমান কয়েল-লাউড-স্পীকারের সঙ্গে উপযোগী ট্রান্‌স্‌ফর্মার ব্যবহার করা হয়।

বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রের তিনটি গুণ থাকা দরকার। প্রথম গুণ—সুগ্রাহিতা (sensitivity)। এই গুণের জন্যই সুদূর কোনও স্টেশনের অতি ক্ষীণ তরঙ্গও গ্রাহক-যন্ত্রে বেশ ভাল ভাবে শোনা যায়। দ্বিতীয় গুণ—নির্বাচনশীলতা (selectivity)। বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে এই নিবাচনশীলতার জন্যই বিভিন্ন রেডিও স্টেশনের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব কাছাকাছি হলেও যে স্টেশন শুন্‌তে চাই সেই স্টেশনের তরঙ্গের সঙ্গে গ্রাহক-যন্ত্রটিকে সুর-সঙ্গত বা টিউন করে নিলে তা পৃথক্ ও স্পষ্টভাবে শোনা যায়। বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রের তৃতীয় গুণ—মূলস্বরের সংরক্ষণ। এই গুণের জন্যই দূরের স্টেশনের কথা বা গানের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য (quality) অনেকটা অবিকৃত থাকে। একে ইংরেজিতে fidelity বলে।

ভাল গ্রাহক-যন্ত্রে সুগ্রাহিতা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থারই ইংরেজি নাম volume control। এতে একটি হাতল বা knob ঘুরিয়ে শব্দের জোর কম-বেশী করা যায়। বেতার-প্রেরক-কেন্দ্রের কথা বা গান যাতে বিকৃত বা শ্রুতিকটু না হয় গ্রাহক-যন্ত্রে তারও ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থাকেই ইংরেজিতে tone-control বলে। এতেও হাতল বা knob ঘুরিয়ে ঠিক স্বরটি বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়।

সুপার-হেট সেট ও আধুনিক গ্রাহক-যন্ত্রের বিবিধ ব্যবস্থা

আজকাল সুপার-হেট গ্রাহক-যন্ত্রের প্রচলন হয়েছে। বস্তুত বেতার-জগতে আজ সুপার-হেটেরই রাজত্ব! কিন্তু এই গ্রাহক-যন্ত্র নতুন আমদানি নয়। এর পরিকল্পনা বহুদিন আগেই হয়েছে। ইউরোপের গত মহাযুদ্ধের কোনও কোনও স্থলে সুপার-হেট সেট ব্যবহার করা হয়েছিল। ফেসেন্‌ডেন (Fessenden); ফেরি (Ferry), আর্মস্ট্রং (Armstrong) প্রভৃতি বেতার-বিজ্ঞানীদের সাধনার ফলেই সুপার-হেট সেট আজ এমন সুষ্ঠু ও কার্যকরী হয়েছে।

সাধারণ ভাল্‌ভ-সেটে কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমত বিদ্যুতের স্পন্দন যদি খুব উঁচুহারের হয়—অর্থাৎ বেতার-তরঙ্গ যদি হ্রস্ব হয় তবে ভাল্‌ভের সাহায্যে বিদ্যুৎস্পন্দন খুব বেশী বিবর্ধিত করা যায় না। পর পর অনেকগুলি ভাল্‌ভ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ-স্পন্দন অনেকখানি হয়ত বাড়িয়ে নেওয়া যায়— কিন্তু এতে অল্পকারণেই সেটে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, সাধারণ সেটে সুর বা স্বরের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা কঠিন— কারণ কথা বা গানের বিভিন্ন হারের স্পন্দন সমান ভাবে বিবর্ধিত হয় না। তৃতীয়ত, সাধারণ সেটের নির্বাচন-গুণ (selectivity) অপেক্ষাকৃত অল্প। মোটামুটি এই কয়টি কারণে মূলনীতি ও গঠন-প্রণালীর জটিলতা সত্ত্বেও সুপার-হেট সেটের সমাদর হয়েছে। এই জন্যই বেতার-বিজ্ঞানী আজ সহজকে ছেড়ে কঠিনকে চেয়েছে।

সুপার-হেট সেটের মূলনীতি প্রসঙ্গে ধ্বনি-বিজ্ঞানের কয়েকটি পরীক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধরা যাক্‌, বেহালার পাশাপাশি দুটি তার প্রায় একই সুরে বাঁধা। ছড় টেনে এই তার দুটি যদি একই সঙ্গে ধ্বনিত করা যায় তবে কম্প্র-ধ্বনির মত শব্দ শোনা যায়। একবার

বেশী জোরে, পরক্ষণে কম জোরে— এই ভাবে ক্রমান্বয়ে কিছুক্ষণের জন্য শব্দ হতে থাকে। একে অধিকম্প (beats) বলা হয়। যদি একটি তারের স্পন্দন-সংখ্যা সেকেণ্ডে ২৫৬ হয় আর অন্যটির হয় ২৫২ বা ২৬০, তবে দুটি তার একসঙ্গে বেজে উঠলে সেকেণ্ডে ৪টি অধিকম্প অর্থাৎ সেকেণ্ডে পর পর ৪ বার ধ্বনির কম্পন শোনা যাবে। সেকেণ্ডে ১০।১২টি অধিকম্প হলে আমাদের কান তা ধরতে পারে না। তারদুটির স্পন্দনের হার যদি এমন হয় যে তাদের তারতম্য ধ্বনির স্পন্দন-সংখ্যার অন্তর্গত তবে তারদুটি একসঙ্গে ধ্বনিত করলে এক নীচুহারের বিয়োগ-ধ্বনি (differential tone) শুনতে পাওয়া যায়। বিয়োগ-ধ্বনির স্পন্দন-সংখ্যা মূল ধ্বনিদুটির স্পন্দন-সংখ্যার বিয়োগফল। কখনও কখনও অপেক্ষাকৃত উঁচুহারের ধ্বনিও শোনা যায়। এর স্পন্দন-সংখ্যা মূল ধ্বনিদুটির স্পন্দন-সংখ্যার যোগ-ফল বলে একে যোগ-ধ্বনি (summation tone) বলা হয়। দুটি স্পন্দনের একত্র সমাবেশে নতুন স্পন্দনের সৃষ্টি—তরঙ্গ-বিজ্ঞানের এ এক বিশেষ সিদ্ধান্ত। বিদ্যুৎ-স্পন্দনের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। দুটি বিদ্যুৎ-স্পন্দন যদি একই সার্কিটে হয় তবে বিশেষ ব্যবস্থায় নতুন স্পন্দন দেখা যায়— এর স্পন্দন-সংখ্যা মূল স্পন্দনদুটির স্পন্দন-সংখ্যার বিয়োগফল। বিয়োগ-স্পন্দনের হার যদি ধ্বনির কম্পন-সংখ্যার অন্তর্গত হয় তবে ঐ স্পন্দন হেড-ফোনের মধ্যে চালনা করলে শব্দ শোনা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে দুটি বিদ্যুৎ-স্পন্দনের এই মিশ্রণকে হেটেরোডাইন (heterodyne) বলা হয়। হেটেরোডাইন-প্রক্রিয়ায় যে বিয়োগ-স্পন্দন হয় তা খুবই নিম্নহারের, অর্থাৎ ধ্বনির কম্পন-সংখ্যার পর্যায়ভুক্ত। গ্রাহক-যন্ত্রে এই প্রক্রিয়ায় বেতার-সংকেত শোনা সম্ভব। যদি এরূপ বিয়োগ-স্পন্দন সৃষ্টি করা হয় যার স্পন্দন-সংখ্যা ধ্বনির কম্পন-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক, এই প্রক্রিয়াকে তখন সুপার-হেটেরোডাইন (super-heterodyne) বলে;

এবং এই প্রক্রিয়া যে সেটে প্রয়োগ করা হয় তাকে সুপার-হেটেরোডাইন বা সংক্ষেপে সুপার-হেট সেট বলা হয়।

সাধারণ ভাল্‌ভ-সেটের মত সুপার-হেট সেটেও প্রথমত ভাল্‌ভের সাহায্যে উচ্চহার বিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকে। এরিয়েলে যে উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন শুরু হয় এই স্পন্দনকে প্রথমে বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এই বিবর্ধিত বিদ্যুৎ-স্পন্দন থেকে মধ্যম-হারের বিয়োগ-স্পন্দন উৎপাদন করতে হলে আরও একটি উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন দরকার। সুপার-হেট সেটে সেজন্য ভাল্‌ভের সাহায্যে উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন উৎপাদন করার ব্যবস্থা থাকে। এই বিদ্যুৎ-স্পন্দন ও এরিয়েলের তারের বিবর্ধিত বিদ্যুৎ-স্পন্দন—এই দুই স্পন্দনকে বিশেষ এক ভাল্‌ভে একত্র মিশ্রিত করা হয়। ভাল্‌ভটির একমুখীকরণ বা সমসাধনের গুণ থাকা দরকার। এই ভাল্‌ভকেই মিশ্রক (mixer) ভাল্‌ভ বলে। মিশ্রণের ফলে যে বিয়োগ-স্পন্দন হয় সেই মধ্যম-হারের স্পন্দনই গ্রাহক-যন্ত্রে কাজে লাগানো হয়। বিয়োগ-স্পন্দনের মধ্যম-হারকে ইংরেজিতে Intermediate frequency বা সংক্ষেপে I. F. নাম দেওয়া হয়েছে। এই মধ্যম-হার বিদ্যুৎ-স্পন্দনকে বহুসহস্রগুণ বিবর্ধিত করায় অসুবিধা নেই। কাজেই মধ্যম-হার বিদ্যুৎস্পন্দনের বিবর্ধনের ব্যবস্থা সুপার-হেট সেটের একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এরই নাম মধ্যম-হার বিবর্ধন। কতকগুলি ভাল্‌ভ পর পর বসিয়ে এই বিবর্ধনের কাজ করা হয়। এখানে বলা দরকার যে পর-পর দুটি ভাল্‌ভের যোগাযোগ উপযোগী ট্রান্‌সফর্মারের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হয়। (বিবর্ধিত মধ্যম-হার স্পন্দনের সমসাধন (rectification) হলেই গ্রাহক-যন্ত্রে কথা বা গান শোনা সম্ভব।) সুতরাং সমসাধনের উপযোগী আরও একটি ভাল্‌ভ প্রয়োজন। সমসাধনের পর সাধারণ ভাল্‌ভ-সেটের মত সুপার-হেট সেটেও নিম্নহার বিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকে। শেষ ভাল্‌ভটির প্লেট-সার্কিটে লাউড-স্পীকার লাগানো

হয়। অনেক ক্ষেত্রে উপযোগী ছোট ট্রান্স্ফর্মারের সেকেণ্ডারি লাউড-স্পীকারের কয়েলে এবং তার প্রাইমারি প্লেট-সার্কিটের সহিত যুক্ত থাকে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে সুপার-হেট সেটে পর-পর এই ব্যবস্থাগুলি থাকে, যথা :—

(১) বেতার-প্রেরক-কেন্দ্রের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে যে উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন সঞ্চার করে তার বিবর্ধন।

(২) সেটের ভিতর উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন উৎপাদন।

(৩) সমসাধন-গুণ-বিশিষ্ট মিশ্রক ভাল্‌ভে এই দুই বিদ্যুৎ স্পন্দনের মিশ্রণ ও মিশ্রণের ফলে মধ্যম-হারের বিদ্যুৎ-স্পন্দনের সৃষ্টি।

(৪) মধ্যম-হার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের বিবর্ধন।

(৫) বিবর্ধিত মধ্যম-হার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের সমসাধন।

(৬) নিম্ন-হার বিবর্ধন।

(৭) লাউড-স্পীকারে শব্দের পুনরুৎপাদন।

বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উৎপাদন ও বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনের সহিত তার সংমিশ্রণ, পূর্বে এই দুই কাজ পৃথক্ পৃথক্ ভাল্‌ভে সম্পন্ন করা হ'ত। আধুনিক সুপার-হেট সেটে এই দুই কাজ বিশেষভাবে তৈরি একটি ভাল্‌ভের ভিতর একসঙ্গে করা হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্মিত পঞ্চগ্রিড বিশিষ্ট (pentagrid) ভাল্‌ভ ও অষ্টপদী (octode) ভাল্‌ভ উল্লেখ-যোগ্য। এই উদ্দেশ্যেই আবার ত্রিপদী ভাল্‌ভ ও ষট্‌পদী ভাল্‌ভ একই আবরণের মধ্যে পাশাপাশি বসিয়ে একরকম ভাল্‌ভ তৈরি হয়েছে —একে ত্রিপদী-ষটপদী (triode-hexode) বলা হয়।

ছোট, বড় ও মধ্যম—সব রকম দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের জন্য যে-সব সুপার-হেট সেট আজকাল তৈরি হয় তাতে মধ্যম-হার সাধারণত সেকেণ্ডে ৪৬৫ কিলো-সাইক্‌ল করা হয়। মধ্যম ও দীর্ঘ তরঙ্গের জন্য তৈরি সুপার-হেট সেটে মধ্যম-হার কখনও কখনও সেকেণ্ডে ১৩০ কিলো-সাইক্‌ল করা

হয়। সেটে-তৈরি বিদ্যুৎ-স্পন্দনের হার নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিশেষ বিশেষ কয়েলের সঙ্গে একটি পরিবর্তনশীল কন্‌ডেন্সার থাকে— আবার বেতার-তরঙ্গের জন্য যে বিদ্যুৎ-স্পন্দন হয় তার টিউনিং-এর জন্যও অন্য একটি পরিবর্তনশীল কন্‌ডেন্সার যথাযোগ্য স্থানে বসানো থাকে। একটি মাত্র হাতল বা knob-এর সাহায্যে দুটি কন্‌ডেন্সারই যাতে ঘোরানো যায়, এরকম এক-হাতলের জোড়া কন্‌ডেন্সার (ganged condenser) আধুনিক প্রত্যেক সেটেই ব্যবহার করা হয়। মধ্যম-হার স্পন্দনের বিবর্ধনের জন্য পর-পর যে ভাল্‌ভ ব্যবহার করা হয় তাদের মাঝখানে মধ্যম-হারের উপযোগী ট্রান্‌স্‌ফর্মার থাকে। ট্রান্‌স্‌ফর্মারের প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি কয়েলের সঙ্গে উপযুক্ত মাপের কন্‌ডেন্সার যোগ করা থাকে— যাতে মধ্যম-হার স্পন্দনের সহিত সুর-সঙ্গতি হয়। এই কন্‌ডেন্সারগুলির মান মধ্যে মধ্যে ঠিক করে নেবার ব্যবস্থা থাকে।

সুপার-হেট সেটও দুরকমের তৈরি হয়—mains set ও battery set। সাধারণত ভাল্‌ভ-সেট যেমন D.C., A.C., অথবা A.C., D.C., এ দুয়ের জন্যই তৈরি হয়, সুপার-হেট সেটও সেই-সেই ভাবে নির্মিত হয়ে থাকে।

এইবার আধুনিক বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রের কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা আলোচনা করব। আধুনিক প্রত্যেক গ্রাহক-যন্ত্রেই ধ্বনির সমতা রক্ষার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে—ইংরেজিতে এক automatic volume control এবং সংক্ষেপে A.V.C. বলে। এই A.V.C-ব্যবস্থার কথাই প্রথমে বলা যাক্। দূরের স্টেশন থেকে বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে অনেক সময় সমান জোরের হয় না। দূরের স্টেশনের কথা বা গান সেজন্য কখনও বেশী-জোর, কখনও কম-জোর হয়। এতে কথা বা গান শোনায় অসুবিধা হয় যথেষ্ট। আবার সেটের volume control এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়ে শব্দের জোর বারবার ঠিকমত করে নেওয়াও

কম হাঙ্গামার কথা নয়। সেইজন্যই ধ্বনির সমতা রক্ষার জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার দরকার। বিভিন্ন গ্রাহক-যন্ত্রে এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বিভিন্ন রকমের হয়। মোটামুটিভাবে এই ব্যবস্থার মূলনীতিটি এই :– সাধারণ ভাল্‌ভ-সেটের সমসাধক ভাল্‌ভে ও সুপার হেট সেটের দ্বিতীয় সমসাধক ভাল্‌ভে বিদ্যুৎ-স্পন্দন সমপ্রবাহে পরিণত করা হয়। এই সমপ্রবাহ যদি কোনও উপযুক্ত মানের রোধের ভিতর দিয়ে চালনা করা হয় তবে এই রোধের দুই প্রান্তে বিদ্যুতের চাপ বা ভোল্‌টেজ দেখা যায়। বেতার-তরঙ্গের জোর অনুসারে এই ভোল্‌টেজ কমে কিংবা বাড়ে। সমসাধক ভাল্‌ভের আগে বিবর্ধক ভাল্‌ভগুলির গ্রিডে ও ফিলামেণ্টে এই ভোল্‌টেজ প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা থাকে। ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে ভাল্‌ভের গ্রিডে ও ফিলামেণ্টে বেশী ভোল্‌টেজ পড়লে তার বিবর্ধনী শক্তি কমে যায়, ও কম ভোল্‌টেজ পড়লে তা বেড়ে যায়। এই ভাবে বেশী বা কম-জোরের বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রে এসে পড়লে আপনা থেকেই তা শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সমান জোরের ধ্বনি উৎপাদন ক'রে থাকে।

গ্রাহক-যন্ত্রের সমসাধক ভাল্‌ভ ত্রিপদী বা দ্বিপদী হলেই চলে। কিন্তু A.V.O.র ব্যবস্থায় সুবিধা হয় বলে আধুনিক গ্রাহক-যন্ত্রে দুই-প্লেট-বিশিষ্ট দ্বিপদী (double diode) অথবা অতিরিক্ত দুই-প্লেট-বিশিষ্ট ত্রিপদী (double diode triode) ভাল্‌ভ প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়।

গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে বেতার-তরঙ্গের জোর কম-বেশী হওয়ায় গ্রাহক-যন্ত্রে যে শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তা দূর করবার আধুনিক এক ব্যবস্থা আছে। এখানে তা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই ব্যবস্থায় অন্ততপক্ষে দশ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দূরে দূরে কতকগুলি দিক্‌-ধর্মী (directive) এরিয়েল ব্যবহার করা হয়। এরিয়েলগুলি সাধারণত যে স্টেশন শুনতে চাই সেই দিকের উপযোগী করে খাটানো। প্রত্যেক এরিয়েলের সঙ্গেই এক-একটি গ্রাহক-যন্ত্র থাকে। দূরে দূরে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন এরিয়েলে

কখনও কোনওটিতে তরঙ্গের জোর বেশী হয়, কখনও কোনওটিতে হয় কম। সব গ্রাহক-যন্ত্রের শেষ ভাল্‌ভের প্লেট-সার্কিটগুলি একসঙ্গে যুক্ত থাকায় প্লেট-সার্কিটগুলির মিলিত স্পন্দন মোটামুটি সমান বিস্তারের হয়। এই মিলিত নীচুহারের স্পন্দন লাউড-স্পীকারে চালনা করে সমান-জোরের শব্দ পাওয়া যায়। আধুনিক প্রত্যেক ধ্বনি-সম্প্রসারণ কেন্দ্রেই এরূপ বহুল-পরিগ্রহের (diversity reception) ব্যবস্থা আছে। অবশ্য বহুল-পরিগ্রহের ব্যবস্থায় নানা প্রকার-ভেদ দৃষ্ট হয়।

অনেক বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রেই শব্দ-নিবারক ব্যবস্থা দেখা যায়। যান্ত্রিক দোষের জন্য গ্রাহক-যন্ত্রে যে গোলযোগ হয় তা ছাড়াও নানা বিচিত্র আওয়াজ বা গোলমাল সময় সময় গ্রাহক-যন্ত্রে শুনতে পাওয়া যায়। গ্রাহক-যন্ত্রের বাইরে নৈসর্গিক অথবা অন্যবিধ কারণে বৈদ্যুতিক বিক্ষেপই এই সব গোলযোগের কারণ। যখনই কাছে বা দূরে কোথাও বিদ্যুৎ-পাত হয় সেখানে বিদ্যুৎ-মোক্ষণের ফলে বিদ্যুতের স্পন্দন হয় ও সেই স্থান থেকে বিদ্যুতের বিক্ষেপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব স্পন্দন নীচু-হারের, কাজেই এই সব বিক্ষেপের তরঙ্গগুলি খুবই দীর্ঘ। অপেক্ষাকৃত উঁচুহারের বিক্ষেপও অনেক সময় দেখা যায়। নৈসর্গিক বিদ্যুৎ-বিক্ষেপের জন্য গ্রাহক-যন্ত্রে কত রকমের অদ্ভুত ও গোলমেলে শব্দই না শোনা যায়! এদেরই আবহিক বলা হয়। এদের ইংরেজিতে অ্যাট্‌মস্‌ফেরিক্‌স (atmospherics) বলে। আবহিকের গোলযোগ সম্পূর্ণ দূর করা একরকম অসম্ভব। কোনও কোনও গ্রাহক-যন্ত্রে বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন থাকে, যাতে বাজ ও বিদ্যুৎ হলেও সেটের উপর তাদের প্রভাব অসহনীয় হয় না।

বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক মোটর (motor), পাম্প (pump), রেফ্রিজেরেটার (refrigerator), বৈদ্যুতিক ট্রাম-গাড়ী ইত্যাদির জন্য বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রে অনেক সময় অদ্ভুত ও বিকট শব্দ হয়। বিভিন্ন

বৈদ্যুতিক যন্ত্রে স্পার্ক বা বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গই এর কারণ। বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের জন্য গ্রাহক-যন্ত্রে যে গোলযোগ হয় তা দূর করবার দু'রকম উপায় আছে। প্রথম— গোলযোগের উৎসে স্ফুলিঙ্গ নিবারণ বা প্রশমন। বৈদ্যুতিক পাখায় বা মোটরে উপযুক্ত মাপের কন্‌ডেন্সার লাগিয়ে স্ফুলিঙ্গ অনেক পরিমাণে কমানো সম্ভব। অন্যান্য অনেক জটিল ব্যবস্থারও নির্দেশ আছে। দ্বিতীয়— গ্রাহক-যন্ত্রে গোলযোগ নিবারণ বা প্রশমনের ব্যবস্থা। আধুনিক বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রে শব্দ-নিবারক ব্যবস্থা থাকলেও তা খুব বেশী কার্যকরী হয় নাই।

সাধারণত কানে শুনেই বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র টিউন করা হয়। চোখে দেখেও গ্রাহক-যন্ত্র যাতে টিউন করা যায়, অনেক গ্রাহক-যন্ত্রে সে-ব্যবস্থাও দেখা যায়। এই ব্যবস্থাকে 'ম্যাজিক' চক্ষু (magic eye) বলা হয়। এই বস্তুটি ভাল্‌ভের মত দেখতে হলেও এটি রেডিও সেটের ভাল্‌ভগুলির পর্যায়ভুক্ত নয়। একে ছোটখাটো ক্যাথোড-রে-টিউব (cathode ray tube) বললেও চলে। এর ভিতরের ফিলামেণ্ট থেকে ইলেক্‌ট্রন-প্রবাহ সাধারণত এর মাথায় স্বচ্ছ কাচের উপর গিয়ে পড়ে। এই কাচের উপর প্রতিপ্রভ (fluorescent) বস্তুর প্রলেপ থাকায় ইলেক্‌ট্রনের সংঘাতে স্বচ্ছ অংশটি উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের দেখায়। এর এক অংশ ত্রিভুজের আকারে অনুজ্জ্বল থাকে। কন্‌ডেন্সার ঘুরিয়ে গ্রাহক-যন্ত্র টিউন করলে এই অনুজ্জ্বল অংশটিও উজ্জ্বল হয়ে খাড়া রেখার মত দেখায়।

বেতার-তরঙ্গ ও আয়ন-মণ্ডল

বেতার-প্রেরক-কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সাধারণত এরিয়েলের সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর গা বেয়ে যে তরঙ্গ যায় তাকে ভূ-তরঙ্গ (ground wave) বলা হয়। পৃথিবীর গা বেয়ে যখন বিদ্যুত-তরঙ্গ অগ্রসর হয় পৃথিবীর মাটিতে তখন বিদ্যুৎ-স্পন্দনের সঞ্চার হয়। এইভাবে বেশীদূর যেতে না যেতেই ভূ-তরঙ্গ তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে। ভূ-তরঙ্গের শক্তি-হ্রাসের হার প্রধানত মাটির তড়িৎ-পরিবাহিতার উপর নির্ভর করে। দীর্ঘ বা মধ্যম-তরঙ্গগুলি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে কয়েক শত মাইল পর্যন্ত যেতে পারে— হ্রস্ব-তরঙ্গের দৌড় তার চেয়েও কম। অথচ দেশ-দেশান্তর থেকে কথা বা গান বেতারে শোনা যায় কি করে? বেতারের আদি পর্বেই মার্কোনি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রায় ২০০০ মাইল পর্যন্ত বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়েছিলেন। এ কি করে সম্ভব হ'ল? ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী হেভিসাইড (Heaviside) ও আমেরিকার অধ্যাপক কেনেলী (Kennelly) এর উত্তর দিয়েছিলেন।

১৯০২ সনে হেভিসাইড ও কেনেলী প্রায় একই সময় এই মত প্রচার করেন যে পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০ মাইল ঊর্ধ্বে একটি তড়িৎ-পরিবাহী স্তর আছে। এঁদেরই নামে স্তরটির নামকরণ হয়েছে—কেনেলী-হেভিসাইড স্তর। ভূ-চুম্বকশক্তির পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর বহুপূর্বেই ঊর্ধ্বে একটি তড়িৎ-পরিবাহী স্তরের কল্পনা করা হয়েছিল। বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে হেভিসাইড ও কেনেলী এই পুরাতন পরিকল্পনারই নতুন যুক্তি দিলেন। তাঁদের মতে বেতার-প্রেরক-কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেমন ভূপৃষ্ঠ বেয়ে অগ্রসর হয় তেমনি আবার উপরের দিকে উঠে ঐ স্তরটির উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। এই প্রতিফলিত নিম্নগামী বেতার-তরঙ্গকে সাধারণ ভাষায় আকাশ-তরঙ্গ বলা হয়।

আকাশ-তরঙ্গের সাহায্যেই বেতারে কথাবার্তা বা গান দেশ-দেশান্তর থেকে শোনা সম্ভব হয়েছে।)

তড়িৎ-পরিবাহী স্তর থেকে বেতার-তরঙ্গ কি প্রক্রিয়ায় নেমে আসে? দর্পণে যে আলোর প্রতিফলন হয়, এ কি সে-রকমেরই প্রতিফলন? ইক্ল্‌স (Eccles) ও লারমার (Larmor) এ বিষয়ে গবেষণা করেন। তত্ত্বের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এবিষয়ের মোটামুটি আলোচনাই এখানে যথেষ্ট হবে। কেনেলী-হেভিসাইড স্তরে বহুসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন মুক্ত অবস্থায় থাকে। স্তরের প্রান্ত দেশ থেকে উপরের দিকে অল্প দূর পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রনের ঘনত্ব ক্রমশ বেড়ে যেতে দেখা যায়। বেতার-তরঙ্গ যখন ঊর্ধ্বে উঠে এই স্তরে গিয়ে পড়ে তখন এই স্তরের ভিন্ন ভিন্ন ধাপে আংশিক প্রতিফলন ও প্রতিসরণ (refraction) হয়। বেতার-তরঙ্গের বেশীর ভাগই স্তরের ভিতর প্রবেশ করে ও ভূপৃষ্ঠের দিকে ক্রমশ বেঁক্‌তে বেঁক্‌তে উপরে উঠতে থাকে। এই ঊর্ধ্বগামী তরঙ্গ যখন এক বিশেষ কোণ করে স্তরের কোনও ধাপে আপতিত হয় তখন তার সবটাই প্রতিফলিত হয়ে নীচের দিকে নেমে যায়। নীচে নামবার পথে ইলেক্‌ট্রনের ঘনত্ব ক্রমশ কম বলে বেতার-তরঙ্গের পথ বিপরীত দিকে আবার ক্রমশ বেঁকতে থাকে। অবশেষে স্তরের নিম্নসীমা অতিক্রম করে বেতার-তরঙ্গ তির্যক্‌ভাবে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে।)

বিদ্যুতের স্তর থেকে এই ভাবে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গ প্রেরক-কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। বেতার-তরঙ্গ যদি হ্রস্ব হয় তবে এই দূরত্ব খুব বেশী হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অধিক হলে এই দূরত্বও অপেক্ষাকৃত কম হয়। আবার বেতার-তরঙ্গ যদি খুব বেশী হ্রস্ব হয়, তবে স্তরের ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বেশী হলেও তা ঐ স্তর থেকে প্রতিফলিত হতে পারে না। বেতার-তরঙ্গ তখন স্তর ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

বিদ্যুতের স্তর থেকে আকাশ-তরঙ্গ যখন পৃথিবীতে নামে, পৃথিবীর মাটি থেকেও তা আবার কিছু পরিমাণে উপরের দিকে প্রতিফলিত হয়।
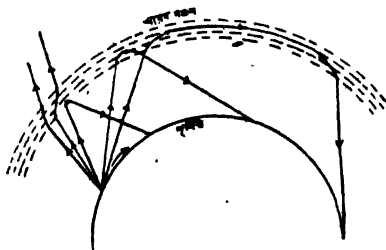
আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের অনুপ্রবেশ ও প্রতিফলন

এই উর্ধ্বগামী প্রতিফলিত তরঙ্গ আবার উপরের স্তরে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আবার নেমে আসে। দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গগুলি ভূপৃষ্ঠ ও উপরের স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে অনেক বার প্রতিফলিত হতে পারে। হ্রস্ব-তরঙ্গের ক্ষেত্রে সময় সময় এমন হয় যে তরঙ্গ উপরে উঠে বিদ্যুতের স্তরে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল পথে চলতে থাকে। এ অবস্থায় বেতার-তরঙ্গের পক্ষে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। এই ভাবে চলতে চলতে স্তরের আভ্যন্তরীণ কোনও পরিবর্তনের ফলে বেতার-তরঙ্গ কখনও কখনও ভূ-গোলকে প্রেরক-কেন্দ্রের প্রায় বিপরীত দিকেও নেমে আসতে পারে।

১৯২৫ সনে সর্বপ্রথম আমেরিকার ব্রাইট (Breit) ও টুভ (Tuve) কেনেলী-হেভিসাইড স্তরের পরীক্ষাগত প্রমাণ দেন। ইংলণ্ডেও প্রায় একই সময় অ্যাপ্‌ল্‌টন (Appleton) নানা ভাবে এই বিদ্যুতের স্তরটির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এর কয়েক বৎসর পর অ্যাপ্‌ল্‌টন আরও উর্ধ্বে আরও একটি বিদ্যুতের স্তর আবিষ্কার করেন। আজকাল এই দুই স্তরের নীচেরটিকে E-স্তর ও উপরটিকে F-স্তর বলা হয়। E-স্তরের ঠিক নীচে

আরও একটি স্তরের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে— এই স্তরটি বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে শোষণ করে ও কচিৎ কখনও প্রতিফলিত করে। এর নাম দেওয়া হয়েছে— D-স্তর। কলিকাতা সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের পরীক্ষার ফলে D-স্তরটি আজ অবিসম্বাদিত রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সূর্যোদয়ের পর থেকেই এই স্তরটির সন্ধান পাওয়া যায়। দিনের বেলায় এবং কখনও কখনও রাত্রে E- ও F-স্তর প্রত্যেকটিই আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এই সমস্ত বিদ্যুতের স্তরকে সমগ্র ভাবে আয়ন-মণ্ডল (ionosphere) নাম দেওয়া হয়েছে। আজ যে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কথা বা গান আমরা অতি সহজেই শুনতে পাই তার মূলে আয়ন-মণ্ডলের E- ও F-স্তর। বেতার-তরঙ্গ উপরে উঠে আয়ন-মণ্ডলে প্রবেশ করে ও অবস্থা অনুসারে কখনও E-স্তর থেকে কখনও বা F-স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়। E- ও F-স্তর থেকে যে আকাশ-তরঙ্গ নেমে আসে দিনের বেলায় D-স্তর তার অনেকখান শোষণ করে; সেজন্য দিনের বেলায় আকাশ-তরঙ্গের জোর বেশী হয় না। সূর্যাস্তের পর রাত্রি বেলায় D-স্তর যখন মিলিয়ে যায় তখন আকাশ-তরঙ্গ বেশ জোরালো হয়ে দেখা দেয়।

বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে কতকগুলি বিষয় আয়ন-মণ্ডলের আবিষ্কারে বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা গিয়েছে। বিষয়গুলির কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) বেতার-প্রেরক-কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যায় বেতার-তরঙ্গের জোর ততই কমে আসে। শেষে জোর এতই কমে যায় যে, গ্রাহক-যন্ত্রে ভাল করে আর ধরা যায় না। কিন্তু আরও দূরে গেলে তরঙ্গের জোর আবার বেশ বাড়তে দেখা যায়। মনে হয়, বেতার-তরঙ্গ অনেকখানি স্থান ডিঙ্গিয়ে হঠাৎ যেন লাফিয়ে এগিয়ে এসেছে! আরও দূরে গেলে আবার তরঙ্গের জোর কমে যেতে দেখা যায়। দূরে যেখানে

তরঙ্গের জোর চরমে উঠে আবার কমতে থাকে প্রেরক-কেন্দ্র থেকে সেই স্থানের দূরত্বকে 'লম্ফ-বিস্তৃতি' (skip distance) বলা হয়।

আয়ন-মণ্ডল থেকে প্রতিফলিত আকাশ-তরঙ্গই এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে। প্রেরক-কেন্দ্র থেকে ভূ-তরঙ্গ ক্রমশ কম-জোর হতে হতে অগ্রসর হয়। শেষে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আরও অগ্রসর হলে আকাশ-তরঙ্গ যেখানে বিদ্যুতের স্তর থেকে নেমে আসে, সেখানে আবার তরঙ্গের জোর বেশী হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? মধ্যম-তরঙ্গের তুলনায় হ্রস্ব-তরঙ্গ প্রেরক-কেন্দ্র থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী দূরে এই ভাবে জোরালো হয়— এ কথা বেশ বুঝা যায়। এই দূরত্ব দিনের তুলনায় রাত্রিতে বেশী, আবার গ্রীষ্মের তুলনায় শীতকালে বেশী। আয়ন-মণ্ডলের প্রতিফলন-তত্ত্বে এ সব তথ্যেরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

(২) অনেকসময় দূরের স্টেশন থেকে বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে সমান জোরের হয় না— এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তরঙ্গের বিস্তার কখনও বাড়ে, কখনও কমে, সেই সঙ্গে গ্রাহক-যন্ত্রেও শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইংরেজিতে শব্দের এই হ্রাস-বৃদ্ধিকেই fading বলে।

আয়ন-মণ্ডলের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই এই হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ। দূরের স্টেশন থেকে বেতার-তরঙ্গ ভূ-পথ ও আকাশ-পথ— এই দুই পথে গ্রাহক-যন্ত্রে পৌঁছতে পারে। একই দৈর্ঘ্যের দুই তরঙ্গ কোনও স্থানে যখন বিভিন্ন পথে আসে তখন ঐ স্থানে তরঙ্গের জোর তরঙ্গদুটির বিস্তারের উপরই শুধু নির্ভর করে না, পথদুটির দৈর্ঘ্যের তারতম্যের উপরও নির্ভর করে। তরঙ্গের এই ব্যতিচারের (interference) কথা পূর্বেই (পৃ. ৫০) উল্লেখ করা হয়েছে। তরঙ্গ-পথের দৈর্ঘ্যের তারতম্য যদি অর্ধ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অথবা তার বিজোড় সংখ্যার গুণিতক হয় তবে তরঙ্গদুটি সমান বিস্তারের হলে ঐ স্থানে চাপে ও খোলে কাটাকাটি হয়ে

কোনও বিস্তারই থাকে না। আবার তরঙ্গ-পথের তারতম্য যদি কোনও পূর্ণসংখ্যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান হয় তবে চাপে চাপে বা খোলে খোলে মিলে ঐ স্থানে তরঙ্গের বিস্তার হয় দ্বিগুণ। তরঙ্গ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তই এই। আয়ন-মণ্ডলের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য আয়ন-মণ্ডলে তরঙ্গের পথ ক্ষণে ক্ষণেই বাড়ে কিংবা কমে। ভূ-পথ ও আকাশ-পথের তারতম্যও সেজন্য ক্ষণে ক্ষণেই বদলায়। ফলে গ্রাহক-কেন্দ্রে তরঙ্গের জোর স্থির থাকে না, ক্রমাগতই তার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

প্রেরক-কেন্দ্র থেকে গ্রাহক-কেন্দ্র যদি এমন দূরে থাকে যেখানে ভূ-তরঙ্গ পৌঁছতেই পারে না, এই অবস্থায় আকাশ-তরঙ্গই গ্রাহক-যন্ত্রে গৃহীত হয়। আয়ন-মণ্ডলের পরিবর্তনের জন্য প্রতিফলিত আকাশ-তরঙ্গের বিস্তারও সমান থাকে না—এরও পরিবর্তন দেখা যায়। এই হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্য দ্রুত নয়।

তরঙ্গ-বিস্তারের আরও একপ্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। গ্রাহক-যন্ত্রে সেজন্য শব্দের ধ্বনিগত রূপও বদলায়। এর নাম সিলেক্‌টিভ ফেডিং (selective fading)। প্রেরক-কেন্দ্র থেকে বাহক-তরঙ্গের সঙ্গে যে পার্শ্ব-তরঙ্গদুটি আসে— আয়ন-মণ্ডলে এদের শোষণ বিভিন্ন হারে হয় বলেই এরূপ ব্যাপার হয়ে থাকে।

(৩) ভূ-তরঙ্গ ও আকাশ-তরঙ্গের মধ্যে স্পন্দনগত পার্থক্য দেখা যায়। ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের বিদ্যুৎ-স্পন্দন সাধারণত ঊর্ধ্বাধ (vertical) তলে তরঙ্গ-পথের আড়াআড়ি ভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিফলিত তরঙ্গে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি সব ক্ষেত্রে সমান নয়। অতি দীর্ঘ তরঙ্গ ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে—আয়ন-মণ্ডল থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ ঊর্ধ্বগামী তরঙ্গেরই মত। কিন্তু মধ্যম ও হ্রস্ব-তরঙ্গের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল সম্পূর্ণ অন্য রকম। আয়ন-মণ্ডল থেকে ফিরে এলে হ্রস্ব-তরঙ্গে বিদ্যুৎ-স্পন্দন বৃত্তের আকারে, আর মধ্যম-তরঙ্গে তা বৃত্ত-প্রায় আকারে হয়, তা

প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেতার-তরঙ্গ আয়ন মণ্ডলে প্রবেশ করে দুই উপাংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন উচ্চতা থেকে প্রতিফলিত হয়ে নীচে নেমে আসে। এই দুই তরঙ্গে বিদ্যুতের স্পন্দন বৃত্তাকার হলেও এদের স্পন্দনের দিক বিপরীত-মুখী। আয়ন-মণ্ডলে ভূ-চুম্বক-শক্তির ক্রিয়ার ফলেই বেতার-তরঙ্গ এভাবে ভাগ হয়ে যায় ও বেতার-তরঙ্গে স্পন্দনগত বৈষম্য দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে অ্যাপ্‌ল্‌টন (Appleton) হার্ট্‌রি (Hartree), গোল্‌ড্‌স্টাইন (Goldstein) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখযোগ্য।

আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের উচ্চতা, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের উপর এদের মধ্যাহ্ন কালীন ইলেক্‌ট্রনের ঘনত্ব, এদের আনুমানিক উষ্ণতা ইত্যাদি নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল।

স্তরের নাম	উচ্চতা	ইলেক্‌ট্রনের ঘনত্ব		উষ্ণতা
		ইংলণ্ড	ভারতবর্ষ	
D	৩০-৪০ মাইল	—	—	—
E_1	৫০ "	৩৮ × ১০^{৫}	৭·৩ × ০^{৫}	৩০০° কেল্‌ভিন
E_2	৭৫ "			
F_1	১১৫ "	১২ × ১০^{৫}	২০ × ১০^{৫}	৬০০° কেল্‌ভিন
F_2	১৫০ "			

সূর্যের আলোই আয়ন-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে আজ কোনও সন্দেহই নাই। আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলির আশ্চর্য বিন্যাস কি করে সম্ভব হ'ল—তাও আজ জানা গিয়েছে। পদার্থের প্রাথমিক উপাদান সম্বন্ধে আধুনিক মত অনুসারে পরমাণুর ভিতর ধন-বিদ্যুতের একটি কোষ থাকে। এই কোষের চারদিকে সূক্ষ্মতম ঋণ-বিদ্যুৎ-কণা অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রন পরিভ্রমণ করে। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে বিভিন্ন কক্ষে

পরমাণু-কোষকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন সংখ্যায় ইলেক্‌ট্রনগুলি ঘুরতে থাকে। ভ্রাম্যমাণ ইলেক্‌ট্রনগুলির ঋণ-বিদ্যুতের পরিমাণ সমগ্র ভাবে পরমাণু-কোষের ধন-বিদ্যুতের সমান—কাজেই সাধারণ অবস্থায় পরমাণুতে কোনও বিদ্যুতের প্রকাশ থাকে না। যদি কোনও উপায়ে পরমাণুর বাইরে থেকে কোনও শক্তি প্রয়োগ করা যায় তবে পরমাণুর ঘুরন্ত ইলেক্‌ট্রনগুলির একটি বা তার বেশী পরমাণু-দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। পরমাণুর এই অবস্থার নাম আয়নিত (ionized) অবস্থা। এই অবস্থায় বিদ্যুতের প্রকাশ হয় এবং এই বিদ্যুদাবিষ্ট পরমাণুকেই আয়ন (ion) বলে। পরমাণুর উপর এক্‌স্‌-রে ফেলে বা অতিদ্রুত কোনও বিদ্যুৎ-কণার সাহায্যে ঘা দিয়ে এই প্রকার আয়ন উৎপাদনের কাজ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে সহজেই করে থাকেন। সূর্যের রশ্মিও খুব শক্তিসম্পন্ন—পৃথিবীর বহির্মণ্ডলে অবস্থিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণুগুলি সূর্যের আলোকপাতে আয়নিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জানা গিয়েছে, ঊর্ধ্বে ৫০ মাইল পর্যন্ত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আণবিক অবস্থায় দেখা যায়। ৫০ থেকে ৮০ মাইলের মধ্যবর্তী স্থানে কিছু অক্সিজেন-অণু অক্সিজেন-পরমাণুতে ভেঙ্গে যায়। ৮০ মাইলের ঊর্ধ্বে কেবল নাইট্রোজেন অণু ও অক্সিজেন-পরমাণু থাকে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে সূর্যের আলোর প্রভাবে পৃথিবীর পরিমণ্ডল কি ভাবে বিভিন্ন স্তরে আয়নিত হয়—আধুনিক বিজ্ঞানে তার এক সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের চ্যাপ্‌মান (Chapman), অ্যাম্‌স্টারডামের পানেকেক (Pannekoek), আমেরিকার হুলবার্ট্‌ (Hulburt) ও আমাদের দেশের ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ও মেঘনাদ সাহার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

দূরেক্ষণ (television)

দূরেক্ষণের প্রধান দুটি পদ্ধতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৭ সনে বেয়ার্ডই সর্বপ্রথম দূরেক্ষণ প্রবর্তন করেন। পরে জোরিকিন এবং ফার্ন্স্‌ওয়ার্থ দূরেক্ষণের যে অন্য দুই ব্যবস্থা করেছিলেন—এদের মূলনীতিতে সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু বেয়ার্ডের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।

প্রথমে বেয়ার্ডের দূরেক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাগুলি মোটামুটিভাবে আলোচনা করা যাক্‌। বেতার টেলিফোনিতে যেমন মাইক্রোফোন যন্ত্র, বেয়ার্ডের দূরেক্ষণ-ব্যবস্থায় তেমনি ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেল (photo-electric cell)। কথা বা গানের জোর অনুসারে মাইক্রোফোনে যেমন বিভিন্ন পরিমাণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়, ফোটো-সেলেও তেমনি আলোর জোর অনুযায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। ফোটো-সেল নানা রকমের হয়। একটি যন্ত্রের মোটামুটি বিবরণ এই—একটি কাচের ছোট গোলকের ভিতর থেকে প্রায় সমস্ত বাতাস বার করে নিয়ে এর মধ্যে দুটি 'পদ' বসানো থাকে। একটি পদকে অ্যানোড (anode) বলে, ধাতুর তৈরি সরু জাল দিয়ে এটি নির্মিত। অন্য পদটি ক্যাথোড (cathode)। এটি কোনও ধাতুর পাত এবং এর উপর সিজিয়াম (caesium) বা ঐ জাতীয় বস্তুর প্রলেপ থাকে। উপযুক্ত কোনও ব্যাটারির ধন-মেরু ও ঋণ-মেরু অ্যানোড ও ক্যাথোডে যথাক্রমে যুক্ত করা হয়। আলো যখন ক্যাথোডের উপর ফেলা হয় ক্যাথোড থেকে তখন অসংখ্য ইলেক্‌ট্রন নির্গত হয়ে অ্যানোডের দিকে যায়। এই ভাবেই ফোটো-সেলের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়। আলোর জোরের উপর এই বিদ্যুৎ-প্রবাহেরও জোর নির্ভর করে।

দৃশ্য বা ছবি আলো ও ছায়ার খেলা। কোথাও বেশী, কোথাও কম, এরূপ বিভিন্ন জোরের আলোক-বিন্দুর সমাবেশেই দৃশ্য বা ছবির

সৃষ্টি। দৃশ্য বা ছবির এক একটি বিন্দু থেকে যে আলো আসে তা যদি ফটো-সেলে ফেলা যায় তবে সেই সেই বিন্দুর আলো তার জোর অনুযায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত হয়। বেয়ার্ডের দূরেক্ষণ-পদ্ধতির এক ব্যবস্থায় দৃশ্য বা ছবিতে বেশ জোরালো আলোর বিন্দু ফেলবার বন্দোবস্ত থাকে। একটি ধাতুর চাক্তিতে কুণ্ডলের (spiral) আকারে সাজানো সারি সারি অনেকগুলি ছিদ্র করা হয়। আর্ক বাতি থেকে আলো লেন্সের সাহায্যে এই চাক্তির ছিদ্রগুলির উপর ফেলা হয়। এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয় যাতে চাক্তিটি জোরে ঘুরালেই পর-পর প্রত্যেকটি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে আলো দৃশ্য বা ছবির উপর গিয়ে পড়ে এবং সমগ্র দৃশ্য বা ছবি এক ক্রমিক পর্যায়ে আলোকিত হয়। আলোকিত দৃশ্য বা ছবির বিভিন্ন
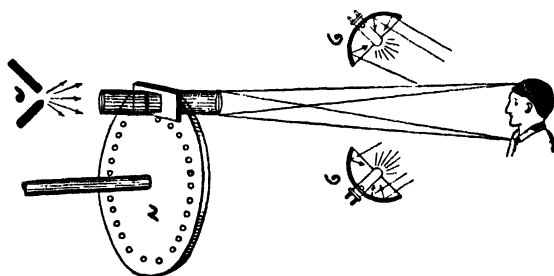
বেয়ার্ডের দূরেক্ষণ পদ্ধতি—(১) আর্ক-বাতি, (২) কুণ্ডলাকারে সজ্জিত ছিদ্রবিশিষ্ট চাক্তি, (৩) ফোটো-ইলেকট্রিক সেল।

বিন্দু থেকে আলোর প্রতিকিরণ (scattering) হয় বিভিন্ন পরিমাণে। কৃষ্ণবর্ণের কোনও স্থান থেকে আলোর প্রতিকিরণ হয় খুবই কম, আবার সাদা বা উজ্জ্বল অংশ থেকে আলোর প্রতিকিরণ হয় বেশি। কাছেই ফোটো-সেল বসানো থাকে, প্রতিকিরণের এই কম-বেশী আলো এই সেলের ক্যাথোডে গিয়ে পড়ে এবং আলোর জোর অনুসারে এতে বিভিন্ন পরিমাণের বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। সাধারণ ব্রডকাস্টিং-এ

যেমন মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎ-প্রবাহকে বিবর্ধিত করে ও বেতার-প্রেরক-যন্ত্রের উচ্চহার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উপর তা চাপিয়ে কথা বা গানের মিশ্র তরঙ্গ পাওয়া যায়, দূরেক্ষণের প্রেরক-যন্ত্রেও তেমনি ফোটো-সেলের কম-বেশী বিদ্যুৎ-প্রবাহ অনেকগুণ বিবর্ধিত করে ও বেতার-প্রেরক-যন্ত্রের উচ্চহার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উপর তা চাপিয়ে দৃশ্য বা ছবির মিশ্র তরঙ্গ পাওয়া যায়। এই হ'ল দূরেক্ষণ-প্রেরক-কেন্দ্রের কথা। দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি কথা বা গান পাঠাতে হয়, তবে আরও একটি প্রেরক-যন্ত্র দরকার। এই প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়েল থেকেই কথা বা গানের মিশ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠানো হয়।

দৃশ্য বা ছবির মিশ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে এসে পড়ে তখন তাতে মিশ্র স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এই মিশ্র বিদ্যুৎ-স্পন্দন থেকে দৃশ্য বা ছবির কম-বেশী বিদ্যুৎ-প্রবাহকে পৃথক করে দেওয়াই দূরেক্ষণ-গ্রাহক যন্ত্রের প্রথম কাজ। এই কম-বেশী বিদ্যুৎ-প্রবাহই পরে কম-বেশী জোরের আলোয় রূপান্তরিত করা হয়। বেয়ার্ডের পদ্ধতিতে সেজন্য সাধারণ গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে এক বিশেষ বাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ছোট একটি ভাল্‌বে অত্যন্ত অল্প চাপের অতি সামান্য পরিমাণ নিয়ন (neon)-গ্যাস ভরা থাকে। একেই নিয়ন-বাতি বলে। এর ভিতর দুটি নিকেলের তড়িৎ-দ্বার (electrode) থাকে। ব্যাটারির সাহায্যে এ দুটির ভিতর ১৫০।২০০ ভোল্‌ট প্রয়োগ করলে যেটি ঋণ-মেরুর সহিত যুক্ত করা হয় তা থেকে হল্‌দে-নারেঙি রঙের আলো বেরুতে থাকে। আলোর জোর ভোল্‌টেজের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই নিয়ন-বাতির ভিতর দিয়ে যখন দৃশ্য বা ছবির বিভিন্ন পরিমাণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করা হয় তখন এই বাতির উজ্জ্বলতা বিদ্যুৎ-প্রবাহের অনুপাতে কমে বাড়ে। দূরের দৃশ্য বা ছবির আলো-ছায়ার সঙ্গে নিয়ন-বাতির কম-বেশী আলোর সঙ্গতি থাকে সন্দেহ নাই। প্রেরক-কেন্দ্রে যেমন

ছিদ্রবিশিষ্ট চাকৃতি ঘুরিয়ে সমগ্র দৃশ্য বা ছবির প্রত্যেকটি বিন্দুতে পর-পর ক্রমিক নিয়মে আলো ফেলা হয়—ঠিক সেই ভাবে গ্রাহক-কেন্দ্রেও যদি নিয়ন-বাতির কম বা বেশী জোরের আলো অন্য একটি একই ধরণের ঘুরন্ত চাকৃতির সারি সারি কুণ্ডলাকারে সজ্জিত ছিদ্রের ভিতর দিয়ে কোনও পর্দায় ফেলা যায় তবে দূরের দৃশ্য বা ছবি ঐ পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে। বেয়ার্ডের দূরেক্ষণ পদ্ধতির এই হ'ল মূল কথা। এই পদ্ধতিতে দৃশ্য বা ছবির বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ যান্ত্রিক (mechanical)—ছিদ্রবিশিষ্ট চাকৃতি ঘুরিয়ে তা সাধিত হয়। বেয়ার্ড পরে এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এক নতুন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি একটি ড্রাম (drum)-এর চারদিকে অথবা একটি চক্রের পরিধিতে ৩০টি ছোট ছোট প্রতিফলক বা দর্পণ লাগিয়ে ঐ ড্রাম বা চক্রটিকে ঘোরাবার ব্যবস্থা করেন। দর্পণগুলির নতি (inclination) ক্রমিক পর্যায়ে এমন ভাবে ঠিক করা হয় যাতে ড্রাম বা চক্রটি সম্পূর্ণ এক বার ঘুরালে দৃশ্য বা ছবির প্রত্যেক বিন্দু থেকে আলো ঐ ৩০টি দর্পণে পড়ে, ও তা থেকে প্রতিফলিত হয়ে সমগ্র দৃশ্য বা ছবি পাশাপাশি ও পর-পর ৩০টি আলোর রেখায় বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। গ্রাহক-কেন্দ্রেও ঠিক এমনি দর্পণযুক্ত চক্র বা ড্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

জোরিকিন ও ফার্নসওয়ার্থ দূরেক্ষণের যে দুই ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে দৃশ্য বা ছবির বিশ্লেষণ বৈদ্যুতিক উপায়ে করা হয়। জোরিকিনের ব্যবস্থায় প্রেরক-কেন্দ্রে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম ইকনোস্‌কোপ (Iconoscope)। এই যন্ত্রটি তড়িৎ-বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য ও প্রয়োজনীয় যন্ত্র ক্যাথোড-রে-টিউব (cathode ray tube)-এরই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। ক্যাথোড-রে-টিউব একটি লম্বা চোঙ-যুক্ত ক্রম-বর্ধমান কাচের আধার। এর ভিতর থেকে বাতাস প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্কাশিত করে নেওয়া হয়। চোঙের এক প্রান্তে কোনও উপযোগী

ধাতুর ফিলামেণ্ট থাকে। ফিলামেণ্টের সামনেই পর পর দুটি প্লেট বসানো থাকে। এই দুই প্লেটের মাঝখানে একটি করে ছিদ্র থাকে। এই প্লেটদুটি বড় একটি ব্যাটারির ধন-মেরুর সঙ্গে ও ফিলামেণ্টের এক প্রান্ত ব্যাটারির ঋণ-মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ফিলামেণ্টে বিদ্যুৎ চলাচল হলেই ফিলামেণ্ট থেকে অসংখ্য ইলেক্‌ট্রন বা ক্যাথোড-রশ্মি প্লেট দুটির দিকে ছুটে যায় ও প্লেটের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে যন্ত্রটির অন্য প্রান্তে গিয়ে পড়ে। এই প্রান্তটির সমতল ও বৃত্তাকার কাচখণ্ডে প্রতিপ্রভ কোনও বস্তুর প্রলেপ থাকায় কাচখণ্ডের যেখানে এসে ইলেক্‌ট্রন-গুলি আঘাত করে সেখানে সবুজ বা নীল রঙের দাগ পড়ে। ফিলা-

ক্যাথোড-রে-টিউব (Cathode ray tube)—(১) ফিলামেণ্ট (২) ফিলামেণ্টের চারদিকে ধাতুর চোঙ (shield), (৩) ছিদ্রবিশিষ্ট অ্যানোড, (৪) দুই জোড়া সমান্তরাল ধাতুর প্লেট (deflecting plates), (৫) প্রতিপ্রভ বস্তুর প্রলেপ-দেওয়া কাচ-খণ্ড (fluorescent screen)
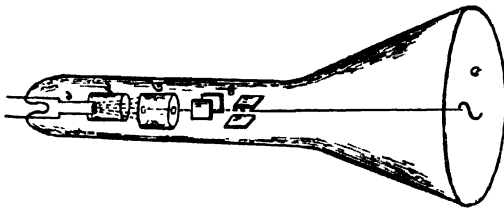
মেণ্টের চারদিকে একটি ধাতুর সরু নল থাকে; তাতে পরিমাণমত ভোল্‌টেজ বা বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগ ক'রে ফিলামেণ্টের ইলেক্‌ট্রনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। কাচখণ্ডের উপর ইলেক্‌ট্রনগুলিকে এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে কেন্দ্রীভূত করলে আলোর দাগটি সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল হয়। যন্ত্রের ভিতর ইলেকট্রন-রশ্মির দুধারে দুজোড়া সমান্তরাল প্লেট থাকে। এই দুই যুগ্ম-প্লেটে ভোল্‌টেজ প্রয়োগ করে কাচখণ্ডের উপর সূক্ষ্ম আলোর দাগটিকে খাড়া ও আড়াআড়ি দুই দিকেই চালিত করা সম্ভব। ইকনোস্‌কোপ-

যন্ত্রের প্রান্তে প্রতিপ্রভ বস্তুর প্রলেপ-দেওয়া সমতল ও বৃত্তাকার কাচ খণ্ডটি ও যুগ্ম প্লেটদুটি থাকে না। উপরন্তু কাচের আধারটির ভিতর খাড়াভাবে একটি অভ্রের পাতলা পাতা বা শীট (sheet) বসানো থাকে। এই অভ্রের ভিতর বিশেষ প্রক্রিয়ায় অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও আলাদা আলাদা রূপার কণিকা সন্নিবেশিত থাকে এবং এদের উপর সিজিয়াম-ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। অভ্রের পিছনেই পুরু তামার পাত থাকে। তামার পাতটির সঙ্গে বিবর্ধক ভালভের যোগ থাকে।

দূরেক্ষণের দৃশ্য বা ছবির প্রতিচ্ছবি (image) লেন্সের সাহায্যে ইক-নোস্কোপের ভিতর অভ্রের পাতটির উপর ফেলা হয়। সিজিয়ামের
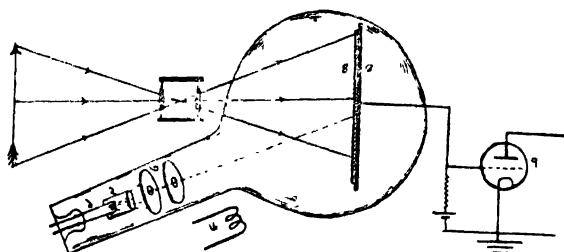
ইকনোস্কোপ (Iconoscope)— (১) ফিলামেণ্ট, (২) ধাতুর চোঙ (shield), (৩) আনোড, (৪) রূপার কণিকাযুক্ত অভ্রের পাৎলা পাতা বা শীট (sheet), (৫) তামার পীঠ, (৬) কয়েল—করাতের দাঁতের আকারের বিদ্যুৎ-প্রবাহ এর ভিতর দিয়ে চালনা করা হয়, (৭) বিবর্ধক ভাল্‌ভ।

প্রলেপ-দেওয়া রূপার উপর আলো পড়া মাত্র তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হতে থাকে। এইভাবে ঋণ-বিদ্যুৎ বেরিয়ে গেলে রূপার কণাগুলি ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ হয়। প্রতিচ্ছবির সব স্থানে আলোর জোর সমান হয় না। আলোর জোরের এই তারতম্যের ফলে অভ্রের ভিতরকার বিভিন্ন রূপার কণায় বিভিন্ন পরিমাণ ধন-বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়। এই ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপার কণায় যদি ইলেক্‌ট্রন-রশ্মি গিয়ে পড়ে তবে ইলেক্‌ট্রনের

ঋণ-বিদ্যুৎ রূপার কণার ধন-বিদ্যুতে মিলে কতকটা কাটাকাটি হয়ে তামার পাতে অল্প-বিস্তর বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেখা দেয়।

ইলেকট্রনের রশ্মি খাড়া ও আড়াআড়ি ভাবে অভ্রের গায়ে প্রতিচ্ছবিটির উপর পর-পর ক্রমিক পর্যায়ে যাতে পড়তে পারে ইকনোস্কোপে তার ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থায় দু'জোড়া তারের কয়েল যন্ত্রের বাইরে ইলেক্ট্রন-রশ্মির দু'ধারে আড়াআড়ি ভাবে রাখা হয় ও তাদের মধ্য দিয়ে করাতের দাঁতের আকারে তরঙ্গায়িত বিদ্যুৎ-প্রবাহ (saw-tooth current) চালনা করা হয়। অভ্রের গায়ে বিভিন্ন পরিমাণ ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ রূপার কণায় যখন ইলেক্ট্রন-রশ্মি পর্যায়ক্রমে এসে পড়ে তখন তামার পাতে সেই একই ক্রমে বিভিন্ন পরিমাণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতে থাকে। এই কম-বেশী বিদ্যুৎ-প্রবাহ মূলত দূরেক্ষণের দৃশ্য বা ছবির কম-বেশী আলোর জোরের উপর নির্ভর করে। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহই যখন বিবর্ধিত করে প্রেরক-যন্ত্রের উচ্চহার স্পন্দনের উপর চাপানো যায় তখন এই দৃশ্য বা ছবির মিশ্র বা বিকৃত তরঙ্গ প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়েল থেকে সঞ্চারিত হয়।

ফার্নস্ওয়ার্থের দূরেক্ষণ-ব্যবস্থায় প্রেরক-কেন্দ্রে একটি নতুন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটির নাম ইলেক্ট্রন ক্যামেরা (Electron camera)। যন্ত্রটি খুবই কার্যকরী। এই ব্যবস্থাতেও দৃশ্য বা ছবির ক্রমিক বিশ্লেষণ ইলেক্ট্রন-রশ্মির সাহায্যেই করা হয়।

দৃশ্য বা ছবির মিশ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে এসে পড়ে এরিয়েলের তারে তখন একই রকমের মিশ্র বিদ্যুৎ-স্পন্দন শুরু হয়। গ্রাহক-কেন্দ্রে একটি সুগ্রাহী গ্রাহক-যন্ত্র ও সেই সঙ্গে একটি ক্যাথোড-রে-টিউব থাকে। গ্রাহক-যন্ত্রটি মিশ্র বিদ্যুৎ-স্পন্দন থেকে দৃশ্য বা ছবির বিদ্যুৎ-প্রবাহকে পৃথক্ করে দেয়। ক্যাথোড-রে-টিউবে ফিলামেন্টের চারদিকে যে ধাতুর নল (shield) থাকে সেই নলে এই বিভিন্ন পরিমাণের

বিদ্যুৎ চালনা করা হয়। ফলে এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের অনুপাতে ইলেক্‌ট্রন-রশ্মির জোর কখনও কম এবং কখনও বেশী হয়। প্রেরক-কেন্দ্রের ইকনোস্‌কোপে যেমন ইলেক্‌ট্রন-রশ্মি খাড়া ও আড়াআড়ি ভাবে পর পর ক্রমান্বয়ে চালিত হয়, গ্রাহক-কেন্দ্রের ক্যাথোড-রে-টিউবেও তেম্‌নি ইলেক্‌ট্রন-রশ্মিকে সেই একই ভাবে চালিত করা হয়। সব ব্যবস্থা ঠিকমত হলে ক্যাথোড-রে টিউবের প্রান্তে প্রতিপ্রভ বস্তুর প্রলেপ দেওয়া কাচখণ্ডে প্রেরক-কেন্দ্রের দৃশ্য বা ছবি দেখা যায়। গ্রাহক-কেন্দ্রের ক্যাথোড-রে-টিউবকে কিনেস্‌কোপ (Kinescope) বলা হয়।

দূরেক্ষণের আরও একটি পদ্ধতি বর্তমান মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মেনীতে প্রচলিত ছিল। প্রথমে দৃশ্য বা ঘটনাবলীর সিনেমা-চিত্র নেওয়া হয়; এই সিনেমা-চিত্রই পরে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে প্রেরিত হয়। ঘটনা-পরম্পরার ছবি-গ্রহণ, ছবি-প্রেরণ ও গ্রাহক-কেন্দ্রে সেই ছবির পুনরুৎপাদন— এ সবই ঘটনার এক মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। বস্তুত এ-ব্যবস্থাকে ঠিক দূরেক্ষণ বলা যায় না; কিন্তু এতে সুবিধা এই যে গ্রাহক-কেন্দ্রে সিনেমার ছবির মত বড় আয়তনেব ছবি পাওয়া যায়। দূরেক্ষণের অন্য ব্যবস্থায় ছবির আয়তন দু'ফুট চৌকোর বেশী হয় কিনা সন্দেহ।

দূরেক্ষণের জন্য যে উচ্চহার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উপর দৃশ্য বা ছবিব বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োগ ক'রে মিশ্রতরঙ্গের উৎপাদন করা হয়—ছবির স্পষ্টতার জন্য তার স্পন্দনের হার অতিরিক্ত বেশী হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত বাহক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ১০ মিটারেরও কম হলে ছবি বেশ ভাল হয়। এই অতি-হ্রস্ব-তরঙ্গের আবার অন্য রকমের বিশেষ অসুবিধা আছে। প্রথমত—আয়ন-মণ্ডলে প্রতিফলনের সাহায্যে অতি-হ্রস্ব-তরঙ্গকে আকাশ-পথে দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত— এরূপ হ্রস্ব-তরঙ্গ পৃথিবীর গা বেয়ে ৪০।৫০ মাইলের বেশী অগ্রসর হতে পারে কিনা সন্দেহ।

এই কারণেই দূরেক্ষণের দৌড় খুব বেশী হতে পারে না। তবে যতটা দূর সম্ভব বেতারে এবং এর চেয়েও বেশী দূরে তারের সাহায্যে দূরেক্ষণের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ভাবে করা সম্ভব।

বর্তমান মহাযুদ্ধের পূর্বেই ইংলণ্ডে Baird Television Ltd. এবং Marconi & Electric & Musical Industries Ltd. (সংক্ষেপে Marconi—E M I.) দূরেক্ষণের কাজ নিয়মিত ভাবে আরম্ভ করেন। বেয়ার্ড কোম্পানি বেয়ার্ডের পদ্ধতি আর Marconi—E M I. ইলেক্ট্রন-রশ্মির বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৯৩৬ সনে উত্তর লণ্ডনের আলেকজাণ্ড্রা প্যালেস (Alexandra Palace) থেকে শেষোক্ত কোম্পানি যে নিয়মিত ভাবে দূরেক্ষণের প্রোগ্রাম শুরু করেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ৩ থেকে ৮ মিটারের বাহক-তরঙ্গ এই কাজে ব্যবহার করা হ'ত। ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এই সময় দূরেক্ষণের নিয়মিত প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়। নিতান্তই দুঃখের বিষয়, বর্তমান মহাযুদ্ধে দূরেক্ষণের কাজ আর অগ্রসর হতে পারে নি—এ বিষয়ের গবেষণাও এখন একরকম বন্ধ রয়েছে।

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২৩	Thomas Elva Adision	Thomas Elva Edison
৬	চিত্রের পাঠ	গ—গ্রিভ,	গ—গ্রিড,
১৯	৯	(γ-ray) বিকিরণ	(γ-ray)-র বিকিরণ
৩৯	১৬	নিমিত	নির্মিত
৪৮	১৯	তার-প্রেরক	তার প্রেরক

৩৩ পৃষ্ঠায় ১-২ পঙ্‌ক্তিতে "প্রেরক-যন্ত্রের যে সার্কিট বিদ্যুৎ-স্পন্দন হয়, সেই সার্কিটের কয়েলের এক প্রান্ত"—অংশ বর্জ্জনীয়।

লোকশিক্ষা

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তুর আলোচনা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ হইতে বিস্তৃততর হইবে।

"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে; অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।"

—লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ

১. বিশ্বপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
৩. পৃথ্বীপরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪. আহার ও আহার্য : শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
৫. প্রাণতত্ত্ব : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. বাংলাসাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী
৭. ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়